প্রথম আলো

ছোট ছোট ভূমিকম্প বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমায়, তা ঠিক নয়

বিশেষ সাক্ষাৎকার

মাইকেল এস স্টেকলার

মাইকেল এস স্টেকলার একজন ভূ-পদার্থবিদ। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেমন্ট-ডোহার্টি আর্থ অবজারভেটরির অধ্যাপক। তিনি মূলত পললগঠিত মাটির নিয়ে কাজ করেন। তিনি বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং মিয়ানমারের কিছু অংশে ২০ বছর ধরে কাজ করছেন এবং অসংখ্য মাঠ গবেষণায় অংশ নিয়েছেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর কাজের প্রধান ক্ষেত্র হলো বাংলাদেশ। তাঁর গবেষণা প্রকল্পগুলো টেকটোনিক ও ভূমিকম্পের পাশাপাশি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত। প্রথম আলোর পক্ষ থেকে ই-মেইলে এই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **পার্থ শঙ্কর সাহা**।

প্রথম আলো: আপনি এবং আপনার সহকর্মীরা ২০০৩ সাল থেকে বাংলাদেশে ভূগর্ভের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। ঢাকার আশপাশে সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের এই ধারা দীর্ঘমেয়াদি জিপিএস পর্যবেক্ষণের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর আপনাদের এই পর্যবেক্ষণ এই অঞ্চলের চলমান ভূমিকম্প সম্পর্কে কী জানাচ্ছে?

মাইকেল স্টেকলার: জিপিএস পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এখানে ফোল্ডবেল্টে (এটি এমন একটি ভৌত গঠন, যেখানে পৃথিবীর ভূত্বক টেকটোনিক শক্তির কারণে ভাঁজ বা বাঁক নিয়ে তৈরি হয় এবং সাধারণত অনেক ঘন পলি দিয়ে গঠিত) প্রতিবছরে ১১ থেকে ১২ মিলিমিটার হারে সংকোচন ঘটছে।

এটি একধরনের চাপ তৈরি করছে এবং সম্ভাব্য ভূমিকম্পের একটি ইঙ্গিত দিচ্ছে। সম্প্রতি আমরা এমন কিছু গতিবিধি লক্ষ করেছি, যেখানে হয়তো পাহাড়ি গঠনগুলোতে কিছু ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। যাতে মনে হয়, সামান্য হলেও বিপদের মাত্রা কমাতে পারে। তবে এটা পুরোপুরি ঠিক, তা না-ও হতে পারে।

ফোল্ডবেল্টের নিচে ভারতীয় প্লেটটি সাবডাকশন (দুটি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থল) বা নিম্নগামী হচ্ছে। ওপরের ইন্দো-বার্মা ফোল্ডবেল্ট এবং নিচের ভারতীয় প্লেটের মধ্যবর্তী সীমারেখাই মেগাথ্রাস্ট (মেগাথ্রাস্ট হলো পৃথিবীর বড় প্লেটগুলো একে অপরের নিচে চাপ দেওয়ার কারণে তৈরি হওয়া বড় ভূমিকম্প-সৃষ্ট ফল্ট বা চ্যুতি)।

এটি সেই ভাঙনরেখা, যা বড় ভূমিকম্পের জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে। আমরা ২০১৬ সালের আমাদের প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩ সালে প্রকাশিত ফলোআপ পেপারে সম্ভাব্য ভূমিকম্পের মাত্রা ৮ থেকে ৮ দশমিক ২ পর্যন্ত পুনর্নির্ধারণ করেছি। এ ছাড়া নিচের প্লেট যখন নিম্নগামী হচ্ছে, তখন তাতেও ভূমিকম্প ঘটতে পারে। আমরা মনে করি সাম্প্রতিক ভূমিকম্পটি নিচের প্লেটে হয়েছে এবং মেগাথ্রাস্ট থেকে আসা ঝুঁকিকে প্রভাবিত না-ও করতে পারে।

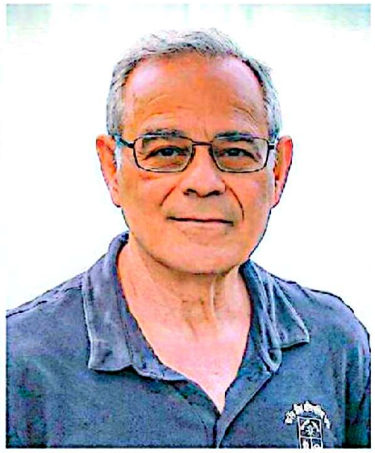

মাইকেল এস স্টেকলার

- আমরা মনে করি এই ভূমিকম্পটি মেগাথ্রাস্টের ওপর বা এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। তাই এটি বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করছে না।
- বর্ষার সময় অগভীর, দুর্বল পলল, বিশেষ করে বালু, তরলের মতো হয়ে যেতে পারে এবং শক্তি হারাতে পারে। এটি এই ভূমিকম্পের সময় ঢাকায় ভবনগুলো সামান্য হেলে যাওয়ার কারণ হতে পারে।
- ভবিষ্যতে মেগাথ্রাস্টে বা বড় চ্যুতির জায়গায় বড় ভূমিকম্প হতে পারে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে, আবার নাও হতে পারে। আমরা সবাই আশা করি এটি দেরিতে হবে।
- পুরোনো ভবনকে ভূমিকম্প-সহনীয় করতে উন্নত করা অনেক ব্যয়বহুল, কিন্তু নতুন ভবনের ক্ষেত্রে খরচ খুব বেশি না বাড়িয়েই তা আরও শক্তিশালী করা সম্ভব।

প্রথম আলো: সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের তলার মাটি প্রতিবছর প্রায় দুই ইঞ্চি উত্তর-পূর্ব দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এই গতিবিধি ঢাকার আশপাশে চাপ জমার সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত এবং এটি কি সাম্প্রতিক ভূকম্পনের সঙ্গে কোনোভাবে সম্পর্কিত?

মাইকেল স্টেকলার: হ্যাঁ, বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রায় ৫ দশমিক ৩ সেন্টিমিটার হারে উত্তর-পূর্ব দিকে সরছে। ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় মূলত প্লেটগুলোর আপেক্ষিক গতির কারণে। সমস্যাটি শুধু এটি নয় যে বাংলাদেশ বা ভারত উত্তর-পূর্ব দিকে চলছে, বরং এশিয়া আলাদা দিক থেকে ভারতের দিকে সরছে, যার ফলে উত্তরে হিমালয় ও শিলং এবং পূর্বে ইন্দো-বার্মা সাবডাকশন জোনের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম আলো: সাম্প্রতিক ছোটখাটো ভূমিকম্পগুলো কীভাবে বড় ধরনের ভূমিকম্পের সম্ভাব্যতা বোঝার ক্ষেত্রে আপনার ধারণাকে প্রভাবিত করছে?

মাইকেল স্টেকলার: দেখুন, এখানে দুটো বিষয় আছে। প্রথমটি হলো, আমরা মনে করি এই ভূমিকম্পটি মেগাথ্রাস্টের ওপর বা এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। তাই এটি বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করছে না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ভূমিকম্পের মাত্রার স্কেল লগারিদমিক। (ভূমিকম্পের মাত্রা লগারিদমিক স্কেলে মাপা হয়। লগারিদমিক বলতে বোঝায় এমন একটি স্কেল বা মান, যেখানে সরল যোগফলের পরিবর্তে পরিমাণ বা মান বৃদ্ধি পায় গুণিতক হিসেবে। লগারিদমিক স্কেলে ১ ইউনিট বৃদ্ধি মানে আগের মানের একটি নির্দিষ্ট গুণ বাড়ানো। উদাহরণস্বরূপ একটি ৬ মাত্রার ভূমিকম্পের শক্তি ৫ মাত্রার ভূমিকম্পের তুলনায় প্রায় ৩২ গুণ বেশি। অর্থাৎ ৫ থেকে ৬ মাত্রা বৃদ্ধি মানে ৩২ গুণ বেশি)।

প্রতি ১ ইউনিট বৃদ্ধির সঙ্গে শক্তি প্রায় ৩২ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২ ইউনিটের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, যেমন ৫ দশমিক ৫ থেকে ৭ দশমিক ৫ পর্যন্ত, শক্তি প্রায় এক হাজার গুণ বেড়ে যায়। তাই ছোটখাটো ভূমিকম্পগুলো বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমাতে বা চাপ কমাতে খুব বেশি প্রভাব ফেলে না।

প্রথম আলো: সাম্প্রতিক ভূমিকম্পগুলো ঘনবসতি অঞ্চলের কাছাকাছি ঘটেছে। যদি বড় ধরনের মেগাথ্রাস্ট ভূমিকম্প ঘটে আপনার মডেলের ভিত্তিতে ঢাকার আশপাশের কোন কোন অঞ্চল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হবে? ঢাকার অনেক অংশ শতাব্দী ধরে জমে থাকা নরম নদীবাহিত পললের ওপর তৈরি। ভূমিকম্পের সময় এই নরম মাটি কীভাবে কম্পন বাড়াতে পারে?

মাইকেল স্টেকলার: যখন ভূমিকম্পের তরঙ্গ এমন মাটিতে প্রবেশ করে, যার পরিবহন ক্ষমতা কম, ধরুন সেটা নরম পলল, তখন তার কম্পনের মাত্রা বেড়ে যায়। এ ছাড়া যদি ভূমিকম্পের তরঙ্গ কোনো অববাহিকার মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিছু নির্দিষ্ট কম্পনের ফ্রিকোয়েন্সি আরও শক্তিশালী হয়ে যায়।

সমগ্র বঙ্গীয় অববাহিকা এত বড় যে সেখানে বৃদ্ধি পাওয়া কম্পনের ফ্রিকোয়েন্সি সম্ভবত ভবনগুলোতে প্রভাব ফেলার মতো নয়। তবে ছোট অববাহিকা, যেমন সিলেটের পাহাড়ের মধ্যে উপত্যকাগুলো, ভবনগুলোতে প্রভাব ফেলার ফ্রিকোয়েন্সিতে কম্পন বাড়াতে পারে। বাংলাদেশে এ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা আছে কি না, তা আমার জানা নেই।

আরেকটি বিষয় হলো, বিশেষ করে বর্ষার সময় অগভীর, দুর্বল পলল, বিশেষ করে বালু, তরলের মতো হয়ে যেতে পারে এবং শক্তি হারাতে পারে। এটি এই ভূমিকম্পের সময় ঢাকায় ভবনগুলো সামান্য হেলে যাওয়ার কারণ হতে পারে।

আমার ছাত্র হাসনাত জামান (বর্তমানে বরিশাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক) তাঁর মাস্টার্স থিসিসে এটি নিয়ে কাজ করেছিলেন এবং ঢাকায় তরলীকরণের ঝুঁকি বেশ আছে, তা মানচিত্রে দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কঠিন মধুপুর লালমাটি অঞ্চল ভালো, তবে মানুষ নির্মাণের জন্য ভরাট করে যেসব জায়গা করছে, সেসব সাম্প্রতিক জমা হওয়া দুর্বল মাটি।

আমার ধারণা হলো, ঢাকায় কোনো ভবন ডিজাইন করার সময় ধরে নেওয়া উচিত যে ওপরের ২ থেকে ৩ মিটার মাটি তরল হয়ে যেতে পারে, তাই তার নিচের ভিত্তি অবশ্যই এমন সুরক্ষিত হতে হবে, যাতে তা পুরো ভবনকে ধরে রাখতে পারে।

প্রথম আলো: ঢাকায় বিশেষ করে ভবনের নকশা ও জরুরি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কোন কোন তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

মাইকেল স্টেকলার: একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভবনের নকশা-সংক্রান্ত নিয়ম কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা। পুরোনো ভবনকে ভূমিকম্প-সহনীয় করতে উন্নত করা অনেক ব্যয়বহুল, কিন্তু নতুন ভবনের ক্ষেত্রে খরচ খুব বেশি না বাড়িয়েই তা আরও শক্তিশালী করা সম্ভব। যদি মানুষ এই অতিরিক্ত খরচ মেনে নিতে রাজি হয়, তাহলে ঢাকা আগামী কয়েক দশক থেকে এক শ বছরের মধ্যে আরও স্থিতিশীল ও ঝুঁকি-প্রতিরোধী শহর হয়ে উঠতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় মৃত্যুর হার কমানোও প্রায় একইভাবে কয়েক দশক সময় নিয়েছিল।

প্রথম আলো: আপনার জিপিএস এবং ভূতাত্ত্বিক তথ্যের ভিত্তিতে কি আমরা সাম্প্রতিক ভূমিকম্পগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট ফল্ট বা ইন্দো-বার্মা পর্বতমালার নিচের লকড মেগাথ্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি? এই উৎসগুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে আমরা কতটা নিশ্চিত হতে পারি?

মাইকেল স্টেকলার: এই ভূমিকম্পটি একটি ফল্টে ঘটেছে, যা কয়েক কিলোমিটার মাটির নিচে চাপা আছে। আমরা সরাসরি এই ফল্টগুলো চিহ্নিত করতে পারি না, তবে বিকৃতি বা ডিফর্মেশনের হার কম হওয়ায় এ ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কাও তুলনামূলকভাবে কম।

বড় বড় চ্যুতির মধ্যে বড় ভূমিকম্প (রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রা পর্যন্ত) ঘটার সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা রয়েছে। সিলেট, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম পাহাড়ের সব স্তর এই চ্যুতির ওপর ধীরে ধীরে আকৃতি বদলাচ্ছে। আর এই পাহাড়ের বেশির ভাগ বা সবগুলো থ্রাস্ট ফল্টের (ভূত্বকের ফাটল) সঙ্গে যুক্ত, যা ৭ মাত্রা বা তার চেয়েও বড় ভূমিকম্প ঘটাতে সক্ষম হতে পারে।

প্রথম আলো: ঢাকার আশপাশে সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের ঘটনাগুলোকে দেখে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারক ও সাধারণ মানুষ ভবিষ্যতের ভূমিকম্পের সময়কাল, মাত্রা এবং সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে কী শিক্ষা নিতে পারে? এই তথ্যগুলো কীভাবে পরিকল্পনা ও ঝুঁকি কমানোর কাজে লাগানো উচিত?

মাইকেল স্টেকলার: ভবিষ্যতে মেগাথ্রাস্টে বা বড় চ্যুতির জায়গায় বড় ভূমিকম্প হতে পারে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে, আবার নাও হতে পারে। আমরা সবাই আশা করি এটি দেরিতে হবে।

বাংলাদেশের অন্যান্য জরুরি সমস্যা আছে। তাই ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমাতে কত সম্পদ ব্যয় করা উচিত—এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। তবে যে কাজগুলো করা খুব জরুরি এর মধ্যে আছে জনসাধারণকে তথ্য প্রদান করা। যাতে তারা বাড়ি ও ভবন আরও ভূমিকম্প-সহনীয় করার অতিরিক্ত খরচ মেনে নিতে পারে।

পরিকল্পনায় এমন খোলা স্থান রাখা উচিত এবং কিছু রাস্তা এমনভাবে তৈরি করা দরকার, যাতে ধ্বংসাবশেষে সেগুলো রুদ্ধ না হয়ে যায়। সাধারণভাবে তৈরি হওয়া কলাম ও স্ল্যাবের আয়তাকার ভবন ভূমিকম্পে ভালো কাজ করে না।

তবে কিছু নকশার পরিবর্তন সাহায্য করতে পারে—যেমন জোড়াগুলো মজবুত করা, তির্যক উপাদান ব্যবহার এবং শিয়ার ওয়াল (ভবনের নিচতলার কার পার্কিংয়ের জন্য যে খোলা কলামগুলো আছে সেগুলোর ফাঁকে ইটের দেওয়াল তুলে দেওয়া)। এ বিষয়ে আরও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন।

প্রথম আলো: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মাইকেল স্টেকলার: আপনাকেও ধন্যবাদ।

CamScanner

প্রথম আলো

চীনের উন্নয়ন

মুক্ত দেশ না হয়েও চীন কীভাবে উদ্ভাবনে এগিয়ে

জেনিফার লিন্ড

এক দশক আগে চীন 'মেড ইন চায়না ২০২৫' ঘোষণা করেছিল। এর লক্ষ্য ছিল, চীনকে সস্তা পণ্যের কারখানা থেকে বিশ্বমানের উদ্ভাবনী শক্তিতে রূপান্তর করা। তখন অনেকেই, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন একনায়কতন্ত্রে উদ্ভাবন সম্ভব নয়। চীনের প্রযুক্তিভিত্তি ছিল দুর্বল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল মাঝারি মানের আর দক্ষ কর্মীর ঘাটতি ছিল। তাই ধারণা ছিল, গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া চীন কখনোই 'নকলপ্রধান দেশ' থেকে বের হতে পারবে না। কিন্তু এত দিনে এসে সেই পূর্বাভাস ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

আমার লেখা *অটোক্র্যাসি ২.০* বইয়ে দেখানো হয়েছে, চীনের নেতারা এই 'রাজাসুলভ দোটানা' কাটিয়ে ওঠার পথ খুঁজে নিয়েছেন। আমি এই মডেলকে বলেছি 'স্মার্ট স্বৈরতন্ত্র'। এটি হলো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের নতুন কৌশলের সঙ্গে নির্বাচিত অর্থনৈতিক খোলামেলা ভাবের মিশ্রণ—যার অনুপ্রেরণা এসেছে প্রযুক্তিশাসিত সিঙ্গাপুর থেকে।

চীন ভারী দমন-পীড়নে না গিয়ে বিভিন্ন সূক্ষ্ম তথ্যনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি চালু করেছে। গবেষক টনি জিরুই ইয়াং বলেন, এই কৌশল মানুষকে সেন্সরশিপের সঙ্গে অভ্যস্ত করেছে। লাঠি-গুলি ব্যবহার না করে চীন ডিজিটাল নজরদারি (যেমন এআই, মুখ চেনার প্রযুক্তি ও বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ) ব্যবহার করে যাতে আগেভাগেই অসন্তোষ চিহ্নিত করা যায়।

অন্যদিকে সরকার অর্থনীতির কিছু অংশ (বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি খাত) খুলে দিয়েছে এবং উদ্ভাবন বাড়াতে বড় বিনিয়োগ করেছে। গবেষণা-উন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। গত দশকে চীনে উচ্চশিক্ষার মান দ্রুত বেড়েছে এবং বিশাল প্রযুক্তিকর্মী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে।

এখন চীন অনেকটা ঊনবিংশ শতকের আমেরিকার মতো। আগে মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিদেশে পড়তে যেত। এখন তারা দেশে থেকেই ভালো শিক্ষা পাচ্ছে। চীন এখন বিশ্বে সর্বাধিক বিজ্ঞান ও প্রকৌশল পিএইচডি তৈরি করে। ২০২৩ সালে যে ওপেন-সোর্স এআই মডেল ডিপসিক বিশ্বকে চমকে দেয়, তার অধিকাংশ প্রকৌশলী চীনেই প্রশিক্ষিত।

চীনা কোম্পানিগুলো এখন কয়েকটি উচ্চ প্রযুক্তি খাতে বিশ্বনেতা। বিশ্বের ৮০ শতাংশ সৌর প্যানেল উৎপাদন ক্ষমতা চীনের হাতে। বৈদ্যুতিক গাড়ি ও ব্যাটারিশিল্পেও তারা শীর্ষে। ২০২৩ সালে চীন জাপানকে পেছনে ফেলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গাড়ি রপ্তানিকারক হয়। আর ড্রোনশিল্পে ডিজিআই একাই ৭০ শতাংশ বৈশ্বিক বাজার দখলে রেখেছে।

চীন এখনো একদলীয় রাষ্ট্র, যেখানে ভিন্নমত দমন করা হয়। তবু উদ্ভাবনে তারা জাপান, জার্মানি, ফ্রান্সকে পেছনে ফেলে গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সে দশম হয়েছে। যদিও 'মেড ইন চায়না ২০২৫'-এর সব লক্ষ্য পূরণ হয়নি, তবু চীন প্রযুক্তির সামনের সারিতে চলে এসেছে। তবে কিছু পর্যবেক্ষক এখনো সন্দিহান। তাঁরা মনে করেন, সি চিন পিংয়ের অধীন বাড়তি দমন-পীড়ন উদ্ভাবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ২০২০ সালে প্রযুক্তি খাতে দমন চালিয়ে

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

সি চিন পিংয়ের নেতৃত্বে চীন উদ্ভাবনে বিস্ময়কর উন্নতি করেছে। ছবি: রয়টার্স

অনেক সম্পদ নষ্ট হয়েছিল; কিন্তু 'স্মার্ট স্বৈরতন্ত্র'-এর লক্ষ্য সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি নয়। তার মূল লক্ষ্য হলো শাসন টিকিয়ে রাখা। তাই কখনো কঠোরতা বাড়ে, আবার কখনো শিথিল করা হয়। সেদিক থেকে দেখলে বোঝা যাবে, ২০২৩ সালের পর চীন প্রযুক্তি খাতে কিছুটা ছাড়ও দিয়েছে।

চীনের আরও বড় কিছু চ্যালেঞ্জ আছে; যেমন বৃদ্ধ জনসংখ্যা, কম এবং ধীর উৎপাদনশীলতা, বিশাল ঋণ এবং রিয়েল এস্টেট সংকট। এগুলো সত্যিই প্রবৃদ্ধিকে কমিয়ে দিয়েছে; তবু চীন ইতিমধ্যে প্রযুক্তি সুপারপাওয়ার হয়ে উঠেছে এবং বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্য বদলে দিয়েছে, যাকে অনেকেই অসম্ভব ভাবত।

তবে এসবের মানে এই নয় যে স্বৈরশাসন গণতন্ত্রের চেয়ে ভালো উদ্ভাবন করতে পারে। গণতান্ত্রিক দেশগুলো এখনো বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বমানের কোম্পানি এবং আন্তর্জাতিক উদ্ভাবনী নেটওয়ার্ক ধরে রেখেছে। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনও প্রথম তৈরি করেছিল গণতন্ত্রসমৃদ্ধ দেশগুলো। তারা এখনো চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সক্ষম।

কিন্তু পশ্চিমা গণতন্ত্রগুলো আর চীনের উদ্ভাবনী শক্তিকে হালকাভাবে নিতে পারে না। প্রযুক্তিতে শক্তিশালী হয়ে চীন তাইওয়ানের জন্য বড় সামরিক হুমকি এবং পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের চ্যালেঞ্জ। তা ছাড়া চীনের এ সাফল্য সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো 'স্মার্ট স্বৈরতন্ত্র' চালানো দেশগুলোকেও উৎসাহ দিচ্ছে। চীন অন্য একনায়কতন্ত্রকেও নজরদারি প্রযুক্তি ও দমন কৌশল দিয়ে সহায়তা করছে।

সি চিন পিং বলেছেন, 'চীনের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতিকে কেউ থামাতে পারবে না!' এটা সত্য হবে কি না, ভবিষ্যতে জানা যাবে; কিন্তু এক বিষয় নিশ্চিত, সেটি হলো পশ্চিমা গণতন্ত্রগুলো আর ধরে নিতে পারে না যে তারা এমনি এমনি এগিয়ে থাকবে।

● **জেনিফার লিন্ড** ডার্টমাউথ কলেজের গভর্নমেন্ট বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং চ্যাটাম হাউসের সহযোগী ফেলো

স্বত্ব: **প্রজেক্ট সিন্ডিকেট**, অনুবাদ: **সারফুদ্দিন আহমেদ**

CamScanner

যে কারণে যুবকদের উদ্যোক্তা হওয়া কমে যাচ্ছে

জান্নাতুল ফেরদাউস অহনা

বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত এগোচ্ছে—শিল্পায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও পরিষেবা খাতসহ নানা ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলছে। সম্প্রতি এ দেশের অর্থনীতিতে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যাচ্ছে, তরুণ প্রজন্মের উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহ আগের মতো নেই। নানা সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যুবকদের একটি বড় অংশ নিরাপদ চাকরির দিকে ঝুঁকছে। শিক্ষা, দক্ষতা, প্রযুক্তি—সবই আগের চেয়ে বেশি সহজলভ্য হওয়ার পরও কেন এই অনীহা? বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা জরুরি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা প্রাথমিক পুঁজি। বহু তরুণের নতুন ধারণা থাকলেও তা বাস্তবে রূপ দিতে পরিবারভিত্তিক বিনিয়োগ বা সঞ্চয় থাকে না। কারণ, ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক বিনিয়োগ। অধিকাংশ তরুণই পরিবারভিত্তিক পুঁজির অভাবে ভোগেন। ব্যাংক ঋণ পেতে হলে প্রয়োজন জামানত, কাগজপত্র আর দীর্ঘ প্রক্রিয়া—যা নতুনদের জন্য বড় বাধা। স্টার্টআপ ফান্ড, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা সহজ শর্তে ঋণ—এসব সুবিধা এখনো পর্যাপ্তভাবে পৌঁছায় না।

আমাদের সমাজে স্থায়ী চাকরি এখনো 'নিরাপত্তা' হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের অনেক পরিবারই ব্যবসাকে ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্থির বলে মনে করে। ব্যবসা ব্যর্থ হলে পরিবার ও সমাজ—দুই দিক থেকেই চাপ তৈরি হয়।

ফলে বহু তরুণ মেধা ও ধারণা থাকা সত্ত্বেও চাকরিকে বেশি স্থিতিশীল মনে করেন। ফলে সমাজে চাকরিজীবী ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে সামাজিক মর্যাদার ধারণাও উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহকে কমিয়ে দেয়। তরুণেরা ব্যর্থতার ভয় ও সামাজিক চাপে চাকরিকে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য শুধু ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন বাজার বোঝা, পরিকল্পনা তৈরি, পণ্য উন্নয়ন, হিসাব-নিকাশ, বিপণন—এই সবকিছুতে দক্ষতা। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উদ্যোক্তা-শিক্ষা এখনো সীমিত। প্রশিক্ষণকেন্দ্র বা ইনকিউবেশন প্রোগ্রাম থাকলেও অনেক তরুণ এর নাগাল পান না।

একটি ব্যবসা শুরু করতে প্রয়োজন ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন, ভ্যাট নিবন্ধন, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিভিন্ন অনুমোদন—এসব প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে দালাল চক্র, অতিরিক্ত সময়, কিছু ক্ষেত্রে হয়রানি। অনলাইন সেবার সুযোগ বাড়লেও বাস্তবে জটিলতা পুরোপুরি দূর হয়নি। উদ্যোক্তা হওয়ার শুরুতেই এমন অভিজ্ঞতা অনেক তরুণকে নিরুৎসাহিত করে।

বাজারের অনিশ্চয়তা ও তীব্র প্রতিযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে। দেশি-বিদেশি পণ্য ও ব্র্যান্ডের প্রতিযোগিতা এতই বাড়ছে যে নতুন উদ্যোক্তারা বাজারে নিজেদের স্থায়ী করতে হিমশিম খাচ্ছেন। বিশ্ববাজারের মন্দা, ডলারের ওঠানামা, আমদানি-রপ্তানির নিয়মে পরিবর্তন—এসব কারণে অনেকেই ব্যবসাকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন। ফলে সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও তরুণের মন পিছিয়ে যায়।

এক জন নতুন উদ্যোক্তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অভিজ্ঞ কারো দিকনির্দেশনা। কিন্তু দেশে মেন্টরশিপ বা নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফরম সীমিত। নতুন উদ্যোক্তারা জানেন না কোথায় গেলে পরামর্শ পাওয়া যাবে, কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলা যায়, কীভাবে বাজার বিশ্লেষণ করতে হয়। ফলে শুরুতেই একাকিত্ব ও অনিশ্চয়তা ভর করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পথে ব্যর্থতা খুব স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যর্থতাকে লজ্জা হিসেবে দেখে। এক বার ব্যবসায় ক্ষতি হলে পরিবার-সমাজ এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় যে অনেক তরুণ দ্বিতীয় বার চেষ্টা করার সাহস পান না। উদ্যোক্তা সংস্কৃতি বিকাশে এই মানসিকতা বড় বাধা।

উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনা অনেক। এজন্য, প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা। বাংলাদেশের যুবসমাজ বিশ্বমানের আইডিয়া, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা রাখে। তাই উদ্যোগ কমে যাওয়ার এই প্রবণতা থামাতে হলে কিছু বিষয় জরুরি—সহজ শর্তে স্টার্টআপ ফান্ড ও ঋণপ্রাপ্তি, উদ্যোক্তা-শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে বড় পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া, ব্যবসার নিবন্ধন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া আরো সহজ করা, দেশের প্রতিটি জেলায় নেটওয়ার্কিং ও মেন্টরশিপ কেন্দ্র স্থাপন, পরিবার ও সমাজের মানসিকতা পরিবর্তন, ব্যর্থতাকে উদ্যোক্তার শেখার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা। বাংলাদেশের তরুণদের হাতে অসীম সম্ভাবনা আছে। শুধু সঠিক সহায়তা ও উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তারা দেশের অর্থনীতিকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

● লেখক : শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

কৃষির ভবিষ্যৎ রূপান্তর : একটি পর্যালোচনা

ড. মো. জামাল উদ্দিন

বাংলাদেশ তার কৃষিযাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। গত পাঁচ দশক ধরে দেশটি খাদ্য ঘাটতিপূর্ণ দেশ থেকে খাদ্য উৎপাদন সাফল্যের একটি বিশ্বব্যাপী উদাহরণে রূপান্তরিত হয়েছে। তবুও জলবায়ু পরিবর্তন, জমির ঘাটতি, জলাবদ্ধতা, বন্যা, খরা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্য চাহিদার ধরন পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জগুলো কৃষির ভবিষ্যৎকে রূপান্তরের দিকে দাঁড় করিয়েছে। বাংলাদেশ যখন ২০৫০ সালের দিকে তাকাচ্ছে, তখন খাদ্যনিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা এবং টেকসই গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি দূরদর্শী এবং আধুনিক কৃষি রূপান্তর (স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি) কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য। সরকারের তরফ থেকে কৃষি মন্ত্রণালয় ২০৫০ সালকে টার্গেট করে ২৫ বছর মেয়াদি এমনি একটি মেগা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এটি একটি ইতিবাচক দিক।

২০৫০ সালের মধ্যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ২১৫ মিলিয়নে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা খাদ্য এবং প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্যের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। একই সময়ে চাষযোগ্য জমি হ্রাস পাচ্ছে। দ্রুত নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং অবকাঠামো সম্প্রসারণের কারণে প্রতি বছর প্রায় ১ শতাংশ কৃষিজমি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন জটিলতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর যুক্ত করছে। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনা ঐতিহ্যবাহী ফসলের ধরনকে হুমকির মুখে ফেলেছে। দক্ষিণাঞ্চল ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততার মুখোমুখি হচ্ছে; উত্তর-পূর্বাঞ্চল আকস্মিক বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে; এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল আরো ঘন ঘন খরার শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অভিযোজন এবং প্রযুক্তিগত রূপান্তর ছাড়া, উৎপাদনশীলতা চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে লড়াই করবে। সুতরাং, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর বহুমাত্রিক যেমন প্রযুক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিবেশগত এবং বাজার-চালিত হবে।

ভবিষ্যতের কৃষিকাজ জৈবপ্রযুক্তি, জিনোম নির্বাচন এবং নির্ভুল প্রজননের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জলবায়ু-সহনশীল জাতগুলোর ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করবে। খরা-সহনশীল ধান, লবণাক্ততা-সহনশীল ধান ও ডাল, বন্যা-সহনশীল এবং তাপ-প্রতিরোধী শাকসবজি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে ফসলের ভূদৃশ্যে প্রাধান্য পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০৫০ সালের মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি খামার ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যান্ত্রিকীকরণ এবং রোবোটিক্স আরো বেশি গুরুত্ব পাবে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারিত হচ্ছে। সরকারি প্রণোদনা এবং স্থানীয় উৎপাদন কৃষকদের কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরতা আরো কমিয়ে দেবে, যা দ্রুত এবং আরো দক্ষ ক্ষেত্র পরিচালনার সুযোগ করে দেবে।

ভবিষ্যতে কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরের জন্য সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য সেচ ও মাটি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেচের ঘাটতি একটি প্রধান উদ্বেগ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। ২০৫০ সালের মধ্যে, নির্ভুল পুষ্টি ব্যবস্থাপনা—জৈব পদার্থ, জৈব সার, সবুজ সার এবং এআই-নির্দেশিত সার সময়সূচি সমন্বিত করা—মাটির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে। নতুন কৃষিক্ষেত্র হবে ধানের বাইরেও বৈচিত্র্যময়। যদিও ধান জাতীয় খাদ্যনিরাপত্তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে, ভবিষ্যতে উচ্চমূল্যের শাকসবজি এবং ফলমূল, গোলমরিচ, হলুদ এবং আদার মতো মসলা; আমদানি-নির্ভরতা কমাতে ডাল এবং তৈলবীজ; পশুপালন, জলজপ্রাণী পালন এবং সমন্বিত কৃষি; ফুল চাষ এবং ঔষধি উদ্ভিদ এবং রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্যের দিকে আরো বৈচিত্র্য দেখা দেবে। বৈচিত্র্যকরণ কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করবে, বাজার স্থিতিশীল করবে এবং ধানভিত্তিক একক চাষ পদ্ধতির ওপর চাপ কমাবে।

ভবিষ্যতে মূল্য সংযোজন, কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজার রূপান্তর হবে প্রধান লক্ষ্য। ২০৫০ সালের মধ্যে, বাংলাদেশের কৃষি খাত উৎপাদনকেন্দ্রিক থেকে মূল্য শৃঙ্খলকেন্দ্রিক (Value Chain) তথা কৃষি প্রক্রিয়াকরণ এবং গ্রামীণ শিল্পে স্থানান্তরিত হবে। ফল, মসলা, শাকসবজি, দুধ এবং মাছের জন্য আধুনিক প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবে এবং ফসল কাটার পরবর্তী ক্ষতি হ্রাস করবে। কোল্ড স্টোরেজ নেটওয়ার্ক এবং রেফ্রিজারেটেড পরিবহন পচনশীল পণ্যগুলোকে সহায়তা প্রদান করবে। ডিজিটাল এবং স্বচ্ছ বাজার ব্যবস্থা ভবিষ্যতে কৃষি রূপান্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হবে। এর জন্য, কৃষকরা ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহার করবেন: ই-কমার্স প্ল্যাটফরম; মোবাইলভিত্তিক বাজার তথ্য ব্যবস্থা; ব্লকচেইন-সক্ষম ট্রেসেবিলিটি; স্মার্ট চুক্তি চাষ। এই ধরনের ব্যবস্থা মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ কমাবে এবং ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করবে।

রপ্তানি প্রতিযোগিতা ভবিষ্যতে রূপান্তর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে। ২০৫০ সালের মধ্যে, কৃষিকে আরো বেশি খাদ্য উৎপাদন করার পাশাপাশি বাস্তুতন্ত্রকেও রক্ষা করতে হবে। এটি করতে মূল কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে—সংরক্ষণ কৃষি (ন্যূনতম চাষ, মালচিং, ফসল রোটেশন); সমন্বিত কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা এবং জৈব কীটনাশক; উঁচুভূমি এবং বসতবাড়িতে কৃষি বনায়ন সম্প্রসারণ; উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত-সহনশীল ভাসমান কৃষি মডেল এবং নবায়নযোগ্য শক্তিভিত্তিক কৃষি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় ইনপুট-নিবিড় কৃষি থেকে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থায় স্থানান্তর অপরিহার্য হবে। কৃষির টেকসই রূপান্তরের জন্য কৃষকদের ক্ষমতায়ণ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

নীতিগত সংস্কার, ভূমি একত্রীকরণ, প্রণোদনা কাঠামো, ফসল বিমা এবং ঋণ সুবিধা কৃষির ভবিষ্যৎ গঠন করবে। আধুনিক, স্থিতিস্থাপক এবং সমৃদ্ধ কৃষিতে ২০৫০ সালের মধ্যে ক্রমান্বয়ে রূপান্তর ঘটাতে পারলে বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে। তাই ২০৫০ সালের পরিকল্পনার বীজ এখনই বপন করার সময়!

● লেখক : প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি

CamScanner

ডেঙ্গু দমাতে দরকার বারোমাসি পরিকল্পনা

প্রফেসর ড. মো. ফখরুল ইসলাম

> সংক্রমণ বাড়লেই তৎপরতা, কমলেই কাজের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। এই চক্র বহু বছর ধরে চলছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন এডিস মশার প্রজননকে এমনভাবে বদলে দিয়েছে যে শীতকালেও সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে। সুতরাং, যে রোগ সারা বছর সক্রিয়, তার সমাধান মৌসুমি পদ্ধতিতে সম্ভব নয়

ডেঙ্গু এখন বাংলাদেশের শহর-গ্রামনির্বিশেষে সব মানুষের কাছে চিরচেনা আতঙ্ক। একসময় বর্ষানির্ভর এ রোগটি আজ সারা বছর সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। এর প্রাদুর্ভাব কখনো কম, কখনো বেশি কিন্তু কখনোই থামছে না। চারদিকে সবাই প্রশ্ন করছেন এবার কেন ডেঙ্গুর প্রতাপ দমছে না? উত্তর একটাই তা হলো, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আমাদের পরিকল্পনা মৌসুমি কিন্তু ডেঙ্গু এখন বারোমাসি রোগ। তাই এর নিয়ন্ত্রণে সমাধানও হতে হবে সারা বছরের সমন্বিত উদ্যোগে।

বাংলাদেশে বছরের পর বছর এর সংক্রমণ বাড়ছে, মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। আর আমরা বহুদিন ধরে এর চিকিৎসায় প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। কীটনাশক স্প্রে, ফগিং, মাইকিং, জরুরি সভা করছি কিন্তু সামগ্রিকভাবে ডেঙ্গু দমছে না। তাই দ্রুত ডেঙ্গুকে একটি জাতীয় স্বাস্থ্যঝুঁকি হিসেবে স্বীকার করা উচিত। এটা কেবল মৌসুমি নগর সমস্যা নয়, গোটা দেশের সমস্যা। ডেঙ্গু এখন জলবায়ু-নির্ভর রোগ, সারা বছর ঝুঁকি তৈরি করে। তবু আমাদের অধিকাংশ উদ্যোগ শুরু হয় বর্ষা মৌসুমের পরে বা সংক্রমণ বাড়ার পর। কিন্তু প্রয়োজন আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া, বারোমাসি পরিকল্পনায় এনে এর জন্য সারা বছরের বাজেট এবং নতুনভাবে প্রশিক্ষিত স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা।

বেশ কয় বছর ধরে ডেঙ্গুকে মৌসুমি সমস্যা হিসেবে দেখার ভুলটি আমাদের বারবার ব্যর্থ করছে। সংক্রমণ বাড়লেই তৎপরতা, কমলেই কাজের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। এই চক্র বহু বছর ধরে চলছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন এডিস মশার প্রজননকে এমনভাবে বদলে দিয়েছে যে শীতকালেও সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে। সুতরাং, যে রোগ সারা বছর সক্রিয়, তার সমাধান মৌসুমি পদ্ধতিতে সম্ভব নয়।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আমাদের বারোমাসি পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত এর উৎস ধ্বংসের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা। ফগিং বা স্প্রেতে মশা সাময়িক কমে, কিন্তু জন্মস্থান অক্ষত থাকলে কয়েক দিনের মধ্যে আবার বাড়ে। তাই প্রতিটি ওয়ার্ডে স্থায়ীভাবে সাপ্তাহিক উৎস শনাক্ত অভিযান ও মাসিক উৎস ধ্বংস টাস্কফোর্স চালু করতে হবে। নাগরিকদের বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সিটি করপোরেশনের তদারকি আরো কঠোর হওয়া জরুরি।

এছাড়া, কীটনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবধান ছাড়া ডেঙ্গু দমন হবে না। অতীতে অকার্যকর ওষুধ ব্যবহারের অভিযোগ ছিল; আবার অনেক সময় পুরোনো ফর্মুলা দিয়েই অভিযান চলে। বারোমাসি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক মানসম্মত কীটনাশক কিনে ব্যবহার, গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা, এবং তদারকিতে বিশেষজ্ঞদের বাধ্যতামূলক উপস্থিতি।

আমরা জানি, নগর অবকাঠামোর উন্নয়ন ছাড়া যে কোনো পরিকল্পনাই অর্ধেক বাকি থেকে যায়। জলাবদ্ধতা, বন্ধ ড্রেন, নির্মাণাধীন ভবনের খোলা পানি—এগুলো এডিস মশার স্থায়ী আবাসস্থল। বারোমাসি পরিকল্পনার একটি বড় অংশ হওয়া উচিত ড্রেনেজ সংস্কার, নির্মাণকাজে নিয়মিত পরিদর্শন এবং দুই একটি প্রজেক্টভিত্তিক না করে সারা বছরের জন্য সব অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করার উদ্যোগ নেওয়া।

আমাদের দেশে নগর পরিকল্পনার চিরায়ত বিশৃঙ্খলা বিরাজমান। প্রশাসনের তদারকির অভাব এবং নাগরিকদের উদাসীনতা মিলিয়ে এডিস মশা যেন রাজ্যের মালিকানা পেয়েছে। শহর ও পৌরসভা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, প্রতিটি সংস্থা আলাদাভাবে কিছু করছে। কিন্তু একীভূত কর্মপরিকল্পনা নেই। সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে দায় ঠেলাঠেলি করা যেন প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বারোমাসি প্রস্তুতি না থাকলে রোগ বাড়লে হাসপাতালগুলো হিমশিম খেতেই থাকবে। যেমনটা গত কয়েক বছর ধরে হচ্ছে। প্রতিটি জেলা হাসপাতালে স্থায়ী ডেঙ্গু কর্নার, সারা বছর নার্স-চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত স্যালাইন, প্লেটিলেট টেস্ট সুবিধা এবং দ্রুত রেফারেল ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পুরো দেশ বা সিটি করপোরেশনগুলোতে প্রতিটি ওয়ার্ডের অলি-গলিতে সংক্রমণের

ডেটাভিত্তিক সিদ্ধান্তই হতে পারে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের মূল অস্ত্র। কোন এলাকায় কত সংক্রমণ, কোন ঋতুতে কোন প্রজাতির মশা বাড়ছে, কোন ওষুধ বেশি কার্যকর—এসব তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ জরুরি। কিন্তু আমরা এখনো তথ্যপ্রতিবেদনের অভাবে নীতি গ্রহণ করি আন্দাজে, যা বারোমাসি পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে।

তাই ডেঙ্গুর পরিবর্তনশীল চরিত্রের ওপর নজর রেখে মাঠ পর্যায়ে এর গবেষণা বাড়াতে হবে। ডেঙ্গুর ভাইরাসের ধরন প্রতি বছর বদলায়, সংক্রমণের গতি বদলায়, রোগীর প্রতিক্রিয়াও পরিবর্তিত হয়। অথচ দেশে গবেষণা সীমিত, নীতি প্রণয়নে গবেষণা-ভিত্তিক সিদ্ধান্তের অভাব আরো সীমিত। প্রত্যেক বছর একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু রোগের আচরণ সে অনুযায়ী ধরা পড়ছে না।

প্রতি বছর একই দৃশ্য দেখা গেলেও এবারের সংক্রমণ পরিস্থিতি সবকিছু ছাপিয়ে ভয়াবহতা জানান দিচ্ছে। এ বছর শীতের আমেজ এসে পড়লেও এর সংক্রমণের ঊর্ধ্বগতি, হাসপাতাল জুড়ে রোগীর চাপ, মৃত্যুর মর্মান্তিক খবর অনেক বেশি, কিন্তু সমাধানের জায়গায় যেন একই স্থবিরতা রয়েই যাচ্ছে।

ডেঙ্গুর টিকা বা ওষুধ যতই উন্নত হোক মূল প্রশ্নটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; তা হচ্ছে, আমরা কি ডেঙ্গুকে সত্যিকারভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি? যদি যথাযথ গুরুত্ব দিতাম তাহলে বছর বছর একই ভুল, একই মৃত্যু, একই আতঙ্ক দেখতাম না। রোগীর স্বজনরা আক্ষেপ করে বলছেন, ডেঙ্গু দমানো যাচ্ছে না কারণ আমরা চাইলে যেভাবে পারতাম সেভাবে এখনো চেষ্টা শুরুই করিনি।

এডিস মশা মানুষের ঘরেই জন্মায়। ফুলদানি, টব, ছাদ, বারান্দার টব, অল্প পানি জমা কোনো পাত্র পেলেই এডিসরা খুশি হয়ে বংশ বিস্তার শুরু করে। তাই বারোমাসি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নাগরিকদের বাধ্যতামূলক সাপ্তাহিক ঘর পরিষ্কার কার্যক্রমকে আইনি কাঠামো ও সামাজিক আন্দোলনের পর্যায়ে নিতে হবে।

যত দিন আমরা আগের বছরের মতো একই মৌসুমি প্রচারণায় আটকে থাকব তত দিন ডেঙ্গু দমবে না। ডেঙ্গুর চরিত্র এখন বারোমাসি, তাই সমাধানও বারোমাসি হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এটি কেবল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা সিটি করপোরেশনের কাজ নয়। এটি সমগ্র রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের যৌথ দায়িত্ব। সমন্বিত উদ্যোগ, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, কঠোর তদারকি এবং নাগরিক অংশগ্রহণ—এই চারটি স্তম্ভে সমস্বরে দাঁড়ালেই কেবল ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

● লেখক : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের প্রফেসর ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন

CamScanner

চীন-জাপানের কৌশলগত সম্পর্কে অপ্রত্যাশিত উত্তেজনা

ড. ফরিদুল আলম

অতীতের মতো চীন এটিই জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে যে তাইওয়ান নিয়ে চীনের চিন্তা-ভাবনার বাইরে কেউ যাওয়ার চেষ্টা করলে তারা যেকোনো সময় যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। দুই পক্ষ যদি দ্রুততম সময়ে সংকট নিরসনে আলোচনায় না বসে, তাহলে হয়তো এই এলাকা অর্থাৎ তাইওয়ান ও দক্ষিণ চীন সাগর ঘিরে উত্তেজনা আরো বাড়বে এবং অন্যান্য দেশও এর সঙ্গে জড়িয়ে যাবে

তাইওয়ান নিয়ে আবার নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে, যার মাত্রা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। এবার এশিয়ায় শক্তিশালী দুই প্রতিবেশী চীন-জাপান একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে। তাইওয়ান নিয়ে চীনের অবস্থান এবং সেখানে চীনের সামরিক অভিযানের সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে গত ৭ নভেম্বর জাপানের সংসদে সে দেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি জানিয়েছিলেন যে চীন যদি তাইওয়ানেও হামলা পরিচালনা করে, তবে নিজেদের নিরাপত্তা শঙ্কা মোকাবেলার স্বার্থে তারাও সেখানে সামরিক অভিযান পরিচালনা করবে। জাপানের এই ঘোষণাকে চীন গুরুত্বপূর্ণ হুমকি হিসেবে দেখছে এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে জাপানে ভ্রমণ পরিহার এবং চীনের শিক্ষার্থীদের জাপানে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এই আহ্বানের পর কমপক্ষে সাতটি চীনা উড়োজাহাজ কম্পানি বিনা মাশুলে যাত্রীদের আগাম টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়ার কথা জানিয়েছে। জানা গেছে, এরই মধ্যে চীন থেকে জাপানগামী কয়েক লাখ ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে চীন বা জাপান কার অর্থনীতিতে কতটা প্রভাব পড়বে, সেটি আপাতত বলা না গেলেও এটি অনুমান করা দুরূহ নয় যে পরিস্থিতির যদি উন্নতি না হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই উভয় দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিষয়টি পুরোই নির্ভর করছে এই উত্তেজনা কত দিন চলবে এবং কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে তার ওপর। চীনের ঘোষণার পর জাপানের পক্ষ থেকেও চীন সফররত জাপানি নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে জনসমাগমপূর্ণ এলাকা পরিহার করে চলতে বলা হয়েছে।

চীন ও জাপানের মধ্যে ঐতিহাসিক কিছু সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়েই এক ধরনের স্থিতাবস্থাকে সমর্থন জানিয়েছে, যার জেরে উভয়ের পারস্পরিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করে। চীনের অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্পের অবদানে সবচেয়ে বড় ভূমিকা জাপানের, দেশটিতে প্রতিবছর প্রচুর সংখ্যায় জাপানি পর্যটক ভ্রমণ করেন। একই সঙ্গে জাপানও এই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে দেশটিতে এক লাখ ২০ হাজারের বেশি চীনা শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে, যা যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীর চেয়ে বেশি। এর বাইরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক এশিয়ার অপরাপর দেশগুলোর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের তুলনায় সন্তোষজনক রয়েছে।

বর্তমান এই উত্তেজনা অতীতের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; যেমন–১৯৪৯ সালের চীনা বিপ্লবের সময় জাপানের পক্ষ থেকে চীনের সরকারকে সমর্থন দেওয়া হয়নি, বরং তাইওয়ান নিয়ন্ত্রিত চীনকেই তারা সমর্থন করে যেতে থাকে। আরো একটু পেছনে তাকালে আমরা দেখব, ১৮৬৮ সালে জাপানে মিজি পুনরুদ্ধারের পর থেকে জাপান পশ্চিমা প্রভাববলয়ের মাধ্যমে চীনের সঙ্গে নতুন বিরোধে জড়ায়, যার এক পর্যায়ে ১৯৩১ সালে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল, পরবর্তী সময়ে চীনের বিশাল এলাকা জাপানের নিয়ন্ত্রণে যাওয়া এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর সময়ে জাপানের দখল থেকে মুক্ত হওয়া–এই সবকিছু দুই দেশের সম্পর্কে স্বাভাবিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭২ সাল থেকে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের নতুন বোঝাপড়ার মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক করা হয়। ১৯৭৮ সালে চীনের পুনর্গঠন নীতির ফলে এই সম্পর্কের আরো উন্নতি ঘটে এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে একে অপরের আরো কাছে আসে। এই সময়ের পর থেকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে বড় ধরনের কোনো অস্থিতি না থাকলেও ২০১০ সালে সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আবার সম্পর্কের কিছুটা অবনতি হলেও দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের স্বার্থে তারা তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। জাপান কর্তৃক ব্যক্তিমালিকানায় থাকা দ্বীপপুঞ্জটি কিনে নিজেদের অংশে পরিণত করার পর থেকে চীন এটিকে নিজের বলে দাবি করে আসছিল। সম্প্রতি জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির তাইওয়ানবিষয়ক বক্তব্যের পর চীন সেখানে কোস্ট গার্ড পাঠিয়েছে এবং ড্রোন অভিযান পরিচালনা করেছে। দ্বীপটি পূর্ব চীন সাগরে অবস্থিত। এটি তাইওয়ানের উত্তর-পূর্বে, চীনের পূর্বে এবং জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। তাইওয়ান থেকে এর দূরত্ব মাত্র ১২০ নটিক্যাল মাইল। চীনের এই অবস্থান নতুন করে উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

আমাদের এখন বোঝা দরকার যে জাপানের পক্ষ থেকে যে বক্তব্যটি এসেছে, সেটিকে তারা নিজেরা কতটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং এর সঙ্গে কি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কি না। আমরা জানি, জাপান ১৯৭২ সালের পর থেকে 'এক চীন' নীতিকে মেনে নিলেও তাইওয়ানের সঙ্গে তারা নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। এর পেছনে কিছু ঐতিহাসিক ও বাস্তবসম্মত কারণ রয়েছে। জাপান একসময় তাইওয়ান উপনিবেশের অংশ ছিল এবং পরবর্তী সময়ে তাইওয়ানের সংস্কৃতিতে জাপানের বড় ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাইওয়ান প্রশান্ত মহাসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থানে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে চীন যদি সেখানে অভিযান পরিচালনা করে সফল হয়, তাহলে সেনকাকু দ্বীপসহ জাপানের নিরাপত্তার জন্য নিশ্চিতভাবেই সংকট সৃষ্টি করবে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণেও এটির প্রভাব পড়বে।

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে এবং এশিয়ার অর্থনীতিতে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে চীন ও জাপান উভয়েই একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে। তাইওয়ানও প্রযুক্তির দিক দিয়ে বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে এবং জাপানের অর্থনীতিতে এর ভূমিকা অপরিসীম। এ ক্ষেত্রে চীনের আগ্রাসন প্রকারান্তরে জাপানের অর্থনৈতিক স্বার্থকেই বাধাগ্রস্ত করবে। তা ছাড়া তাইওয়ানের বাণিজ্যিক পথগুলোও জাপানের বিশ্ববাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই বিবেচনায় জাপানের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বজায় রেখে চলতে হলে তাইওয়ানকে কোনোভাবেই অস্থিতিশীল হতে এবং চীনের নিয়ন্ত্রণে যেতে দেওয়া যাবে না। এটিই হচ্ছে জাপানের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার যত কারণ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হঠাৎ করে কেনই বা জাপানের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এমন বক্তব্য এলো, যা এই নতুন উত্তেজনার জন্ম দিয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গেলে এটি ধারণা করা যেতেই পারে যে তাইওয়ান ও দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের দীর্ঘ সময় ধরেই উত্তেজনাকর সম্পর্ক রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রও জাপানের মতো 'এক চীন' নীতিকে সমর্থন করলেও তাইওয়ানের প্রতি তাদের সমর্থন বরাবরই পক্ষপাতদুষ্ট। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে বৈঠক করতে দেখেছি, সেই সঙ্গে একই সময়ে দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়ায়ও সফর করেছেন তিনি। জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক-পরবর্তী যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প জাপানের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা জানান দেন এই বলে যে জাপানের প্রয়োজনে সব ধরনের সমর্থন দেওয়া হবে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে।

চীনের আচরণে বোঝা যায় যে তারা জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কথার মর্মার্থ অনুধাবন করতে পেরেছে, না হলে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর একটি কথাকে কেন্দ্র করে এমন আক্রমণাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অতীতের মতো চীন এটিই জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে যে তাইওয়ান নিয়ে চীনের চিন্তা-ভাবনার বাইরে কেউ যাওয়ার চেষ্টা করলে তারা যেকোনো সময় যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। দুই পক্ষ যদি দ্রুততম সময়ে সংকট নিরসনে আলোচনায় না বসে, তাহলে হয়তো এই এলাকা অর্থাৎ তাইওয়ান ও দক্ষিণ চীন সাগর ঘিরে দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোসহ আরো কৌশলগত অংশীজন চীনের বিরুদ্ধে একাট্টা হওয়ার চেষ্টা করবে। চীনের পক্ষ থেকেও হয়তো উত্তর কোরিয়ার শাসককে উসকে দেওয়ার চেষ্টা থাকতে পারে। এমনটি হলে অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন ধরনের অস্থিরতা শুরু হতে পারে অঞ্চলটি ঘিরে।

লেখক : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

কৃষিই শক্তি, কৃষকই ভিত্তি

ড. রাধেশ্যাম সরকার

মানুষের সভ্যতার উৎস যে কৃষি, তা আমরা বইয়ে পড়ি, কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন খুব কমই চোখে পড়ে। আদিকাল থেকেই খাদ্যের নিশ্চয়তা মানবজীবনের অন্যতম প্রথম শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে, এবং আধুনিকতার দ্রুতগামী জীবনে সেই সত্য এখনও অপরিবর্তিত। তবু শহুরে জীবনের চকমকে আলোতে আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে প্রতিদিনের ভাতের থালার পেছনে যে মানুষের শ্রম রয়েছে, তিনি এখনও কাঙ্ক্ষিত সামাজিক মর্যাদা পাননি। প্রতিদিন খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের এই অমূল্য অবদান সত্ত্বেও কৃষক সমাজে এখনো সেই প্রাপ্য সম্মান পাচ্ছেন না। সমাজে কৃষকের প্রচলিত চিত্র হলো দরিদ্র, ক্লান্ত, রোদে পোড়া মুখ মাঠে পরিশ্রম করা মানুষ। যদিও উন্নত দেশগুলোতে এই কৃষকরাই দক্ষ উদ্যোক্তা, প্রযুক্তিবিদ এবং উচ্চপ্রযুক্তি ব্যবস্থাপক হিসেবে স্বীকৃতি পান, আমাদের প্রেক্ষাপটে কৃষিকে এখনো কেবল অল্প আয়ের পেশা হিসেবে দেখা হয়। এই মানসিকতা বদলাতে না পারলে কৃষি ও কৃষক উভয়ই পিছিয়ে পড়বে। আমাদের উচিত কৃষিকে একটি পেশার চেয়ে বেশি, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার মূল স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করা।

আজকের সমাজে স্থায়ী চাকরিকে সাফল্য ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। পরিবার ও সমাজের প্রত্যাশা একটি চাকরিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, আর সেই দৌড়ে আমরা ভুলে যাই যে শক্তিশালী কৃষিভিত্তি ছাড়া দেশের অর্থনীতি নিরাপদ থাকতে পারে না। খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিলে উন্নয়নের সকল অর্জনই শুধু কাগজে লেখা হিসেবেই থেকে যাবে। বিআইডিএসের পরিসংখ্যান জানায় যে উচ্চশিক্ষিত তরুণদের প্রায় ৪৬ শতাংশ কোনো স্থায়ী চাকরিতে নিয়োজিত নয়।

এই বিশাল যুবশক্তি যদি দক্ষতা নিয়ে কৃষিখাতে যুক্ত হতে পারে, তবে শুধু উৎপাদন নয়, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, মূল্যসংযোজন শিল্প এবং রপ্তানি খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হতে পারে। দেশে প্রায় পাঁচ কোটি তরুণ রয়েছে। তাঁদের মাত্র এক তৃতীয়াংশ যদি আধুনিক ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি ও কৃষি বিজ্ঞান শেখার পর কৃষিতে যুক্ত হন, বাংলাদেশ শুধু খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করবে না, আন্তর্জাতিক বাজারেও শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে। এটি দেশের জন্য কেবল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নয়, বরং সামাজিক ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতারও নিশ্চয়তা।

কৃষির ঐতিহ্য, রূপান্তর এবং জ্ঞানভিত্তিক অগ্রযাত্রার দীর্ঘ পথচলা আমাদের সভ্যতার গভীর শেকড়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলার ইতিহাস মূলত কৃষিকেন্দ্রিক এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বহু শতাব্দী ধরে কৃষি নির্ভর ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। উর্বর নদীবাহিত পলিমাটি, দেশজ বীজ এবং মৌসুমি বর্ষার নিয়মিত আবর্তন এই ভূখণ্ডের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রধান স্তম্ভ হিসেবে কাজ করেছে। মোগল আমল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসনের জমিদারি প্রথা পর্যন্ত, কৃষক নানা রকম শোষণ, অন্যায় এবং প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন, তবু কৃষির চাকা কখনো থেমে থাকেনি। প্রতিকূলতা, দুর্যোগ এবং সামাজিক অব্যবস্থার মধ্যেও কৃষক তাঁর পরিশ্রম, ধৈর্য এবং মাটির প্রতি অটল নিষ্ঠা ধরে রেখেছেন। এই নিরলস প্রতিরোধ, অব্যাহত উদ্যম এবং পরিশ্রমী মনোভাবই আজকের প্রমাণ যে কৃষক শুধু খাদ্য উৎপাদনকারী নয়, বরং

দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সামাজিক ধারাবাহিকতার জীবন্ত ধারক।

স্বাধীনতার পর দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড় এবং খাদ্যঘাটতির কঠিন বাস্তবতা দেশকে শিখিয়ে দেয় যে কৃষিই জাতীয় উন্নয়নের মেরুদণ্ড। এই উপলব্ধি থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বিএআরসি, বিএআরআই, বিআরআরআই, বিএডিসি, এসসিএ, এসআরডিআই, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ একাধিক গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। এসব প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক কাজ, কৃষকের অভিজ্ঞতা, উন্নত বীজ উৎপাদন, সেচব্যবস্থার বিস্তার এবং যান্ত্রিকীকরণের ফলে গত চল্লিশ বছরে দেশের খাদ্য উৎপাদন চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি শুধু পরিসংখ্যান নয়, বরং এক গভীর পরিবর্তনের সাক্ষ্য, যা প্রমাণ করে যে বিজ্ঞানের সহায়তায় কৃষি নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে।

যে দেশের পরিচয় গঠিত হয়েছে কৃষকের ঘাম, পরিশ্রম ও অবদানের ওপর। তাই কৃষির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা মানে শুধু একটি পেশাকে সম্মান দেওয়া নয়, এটি আমাদের জাতিগত আত্মপরিচয়কে সম্মান করার মানবিক দায়িত্ব। মাটির প্রতি কৃতজ্ঞতা, কৃষকের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আধুনিক প্রযুক্তি, জ্ঞান ও সুশাসনভিত্তিক কৃষি গড়ে তোলার দায়িত্ব আজকের সময়ের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। কৃষি পেশা যেদিন প্রকৃত সম্মান পাবে, সেদিন দেশও আন্তর্জাতিক মঞ্চে সম্মানের আসনে স্থান করে নিবে। কৃষিকে মর্যাদা দেওয়া মানে আগামী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা।

১৯৮০-এর দশক থেকে ধান, গম ও সবজি উৎপাদনে শুরু হওয়া কৃষি বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে খাদ্য উৎপাদনে অন্যতম সফল দেশ হিসেবে স্বীকৃত। গবেষণা, সম্প্রসারণ কার্যক্রম, প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তার এবং কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম এই চারটির সমন্বয়ে দেশের খাদ্যনিরাপত্তা দৃঢ় হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ, আর সবজি উৎপাদনেও তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে এবং বাংলাদেশের সবজি আজ বিশ্বের চল্লিশটির বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ফল উৎপাদনে আম ও কাঁঠালে যথাক্রমে অষ্টম ও দ্বিতীয় স্থান দখল, যা দেশের উপউষ্ণমণ্ডলীয় কৃষির দক্ষতা তুলে ধরে।

তবে জলবায়ু পরিবর্তন বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। লবণাক্ততা বৃদ্ধি, দীর্ঘ খরা বা হঠাৎ বন্যা উৎপাদনকে অনিশ্চিত করে। তবু বাংলাদেশের উদ্ভাবনী স্মার্ট কৃষি মডেল বিশ্বে দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। লবণসহনশীল ধান, ভাসমান কৃষি, সোলারচালিত সেচ, ড্রিপ ও স্প্রিঙ্কলার সেচ এসবপ্রমাণ করে যে প্রয়োজনের মুখে কৃষকরাই সবচেয়ে বড় উদ্ভাবক। তাঁদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষমতা ভবিষ্যতের কৃষিকে আরও টেকসই করে তুলবে।

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য, বাজারসংস্কার এবং ভবিষ্যতের দায়িত্বও অপরিহার্য। দেশে মোট শ্রমশক্তির প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ সরাসরি কৃষিতে যুক্ত থাকলেও জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান মাত্র তেরো থেকে চৌদ্দ শতাংশ। দীর্ঘ মধ্যস্বত্বভোগী শৃঙ্খল কৃষকের ন্যায্য লাভ কমিয়ে দেয়। সংরক্ষণ ব্যবস্থা দুর্বল, ঠান্ডা অবকাঠামো ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যর্থ হলে খাদ্যের অপচয় প্রকট হয়। কৃষি বীমা কার্যকর না থাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আর্থিকভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়েন।

ভবিষ্যতের কৃষিকে হতে হবে প্রযুক্তিনির্ভর, জলবায়ু সহনশীল, ন্যায্যমূল্যভিত্তিক এবং উদ্যোক্তা-বান্ধব। সরাসরি বিপণন ব্যবস্থা, ডিজিটাল ট্রেসিং, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে সরকারি উদ্যোগ এবং দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ এখন জরুরি। কারণ কৃষক শুধু খাদ্য উৎপাদনকারী নন; তিনি দেশের উন্নয়নচক্রের মূল শক্তি। ২০০৮ সালে প্রথম অগ্রহায়ণকে জাতীয় কৃষি দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নতুন ধান ঘরে তোলার আনন্দ, কৃষকের পরিশ্রমের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং কৃষির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রতীক হিসেবে দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বাংলাদেশের মাটি, মানুষ ও ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতেই কৃষি অবস্থান করে।

পরিশেষে বলা যায় যে দেশের পরিচয় গঠিত হয়েছে কৃষকের ঘাম, পরিশ্রম ও অবদানের ওপর। তাই কৃষির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা মানে শুধু একটি পেশাকে সম্মান দেওয়া নয়, এটি আমাদের জাতিগত আত্মপরিচয়কে সম্মান করার মানবিক দায়িত্ব।

মাটির প্রতি কৃতজ্ঞতা, কৃষকের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আধুনিক প্রযুক্তি, জ্ঞান ও সুশাসনভিত্তিক কৃষি গড়ে তোলার দায়িত্ব আজকের সময়ের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। কৃষি পেশা যেদিন প্রকৃত সম্মান পাবে, সেদিন দেশও আন্তর্জাতিক মঞ্চে সম্মানের আসনে স্থান করে নিবে। কৃষিকে মর্যাদা দেওয়া মানে আগামী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা।

লেখক : কৃষিবিদ ও গবেষক

CamScanner

NEWAGE
Founder Editor Enayetullah Khan

Time for govt to bridge inequality fault line

THE findings of a World Bank report that income inequality widened in 2010–2022, leaving about 62 million people, or about a third of the Bangladesh population, vulnerable to slipping into poverty if they were to face an illness, natural disaster or other unwarranted shocks are gravely worrying. The report, however, also says that poverty fell in the period, with 25 million people coming out of poverty and nine million more people coming out of extreme poverty. In the period, extreme poverty declined to 5.6 per cent from 12.2 per cent and moderate poverty declined to 18.7 per cent from 37.1 per cent. A former World Bank economist has, however, said that the Bangladesh Poverty and Equity Assessment 2025 report findings carry little meaning as the report does not say how many people were vulnerable to falling into poverty because of income inequality in 2010 and it is not clear how income inequality has benefited wealthier families. Yet, the grim figures were forthcoming, with about 32.4 million people, as a Power and Participation Research Centre survey made public in November 2021 said, having freshly slid below the poverty threshold during the Covid outbreak.

Income inequality for Bangladesh had already been rising by then, with the Gini coefficient being at 0.499 in 2022, as the Household Income and Expenditure Survey 2022 made public by the Bureau of Statistics in April 2023 showed. The coefficient was 0.483 in 2016 and 0.458 in 2010. A smaller Gini coefficient means more equal distribution of national wealth. The top 10 per cent of the population holds 58.5 per cent of the total national wealth whilst the bottom 50 per cent holds only 4.8 per cent of the wealth. Stagnation in job creation in the manufacturing sector, a shift towards less productive sectors, misdirected subsidies with the wealthier households receiving the bulk of the benefits have, among others, all along been blamed for such a situation. The World Bank report has also identified four major policy areas for the government to work on to reduce poverty and narrow income inequality. The government should strengthen the foundation of productive jobs with the creation of more and better jobs for the poor and the vulnerable, foster a market that works for the poor by investing in modern processing and supporting business regulation, enhance resilience with strong fiscal policy and run effective, well-targeted social protection programmes.

What seems to be the problem is what the execution policy would be, as the issues contributing to poverty and widening inequality have been under discussion for some years now. There has been enough rhetoric in the lofty talk of the government, whichever party is in power, on the reduction of poverty and the narrowing of income inequality. It is time that the government acted with both will and earnestness.

Transparent political funding is democratic imperative

INFORMAL and hidden political financing has for long been discussed as a threat to democracy. Yet, there has been no effective mechanism to rid the political system of hidden and informal financing practices. A recent Dacca Institute of Research and Analytics study, made public on November 24, say that political system continues to operate through informal and opaque funding networks that largely circumvent electoral laws. Although the Representation of the People Order provides for a framework broadly aligned with global standards, the study shows a major disconnect between the laws and actual political practices, resulting in a financing culture dominated by patronage and business influence. The consequence is a weakened democracy. With financial power determining access and influence in politics and policy-making, democratic processes risk becoming hostage to those who can afford to pay rather than those who seek to serve. This also rewards incumbents while creating financial barriers for new political actors, who lack access to wealthy networks and, thus, narrows the political field, resulting in an erosion of political pluralism and elite-centric politics that is inconsistent with democratic equity. The integrity and scope of democracy become severely compromised when money, not ideas, policy or public service, becomes the determinant of political relevance.

The study also says that all major political parties have to a great extent fallen into or adopted positions in which they operate within shadowy financing networks, leaving the parties and their politics vulnerable to moneyed clout. The buying and selling of nominations is one of the most destructive features of the political system, turning parties into fundraising machines rather than ideological organisations and awarding nominations and positions to people with financial influence. Moreover, a lack of effective regulation and oversight makes it difficult for state institutions to monitor the funding networks and expenditure practices of political parties. While the parties are required by law to submit audited annual financial reports and there is a cap on electoral expenditure, oversight remains weak. The dominance of money and the consequent shift in politics are evident in that the business class is now the largest provider of parliamentarians. Businesspeople constituted almost 70 per cent of the last parliament, up from 17 per cent in the first post-independence parliament. The study rightly says that such financing practices have not only weakened democracy by empowering the moneyed class and alienating people from political processes but also damaged policy-making and fuelled corruption.

There is no alternative to ensuring transparent political funding for a more accountable and participatory democracy. To achieve this, the authorities should consider conditional and transparent public financing, realistic spending limits, digital monitoring tools and strengthened disclosure rules, while political parties need to follow transparent funding practices.

Reforming COP

by **Musharraf Tansen**

COP has become a forum where needs are acknowledged but not met. —UN

AS THE dust settles on COP30 in Belém, Brazil, it is painfully clear that the Conference of the Parties, in its current form, is failing to deliver the scale, speed and credibility of action required to confront the climate emergency. What was once envisioned as a ground-breaking multilateral mechanism to unite nations against a common threat has increasingly become a slow-moving diplomatic ritual — heavy on speeches, light on implementation, and structurally constrained by politics, bureaucracy and power imbalances.

Despite decades of negotiations, emissions continue to rise, inequality persists, and the most vulnerable nations remain at the mercy of climate impacts they did little to cause. Meanwhile, debates on finance, mitigation, adaptation and loss-and-damage remain stuck in familiar stalemates. As the world edges closer to breaching the 1.5°C threshold, the limitations of the existing COP architecture are no longer a matter of debate but a matter of survival. The urgent question now is: Has COP lost its effectiveness—and if so, how boldly and how quickly can it be reformed to meet the existential crisis we face?

Limits of the current COP architecture

COP was established to provide a platform where nations could negotiate fair, science-based climate commitments, build trust and mobilise finance and action. Over the past three decades, however, the system has expanded into a sprawling annual gathering hosting tens of thousands of delegates, lobbyists, corporations, observers and media. Yet despite this scale, core outcomes remain modest, incremental and often disconnected from scientific urgency.

The most fundamental limitation lies in the consensus-based decision-making model. While consensus ensures that all countries have a voice, it also enables any single nation to block progress, turning climate diplomacy into a negotiation of lowest-common-denominator outcomes. When nations with deep fossil-fuel dependencies or geopolitical agendas refuse to move, the entire process stalls. The result is watered-down language, voluntary commitments and vague timelines that create the illusion of progress without driving real change.

The architecture is also deeply bureaucratic. The language of negotiations, rigid procedural rules and multi-layered technical committees create a system that is slow to respond and difficult for outsiders to navigate. At a time when climate disasters are accelerating — from deadly heatwaves to catastrophic floods — the gap between urgent climate realities and COP's pace of decision-making widens each year. The process simply cannot keep up.

Another structural weakness is the entrenched imbalance of influence. Wealthy nations and powerful industries often dominate informal negotiations, while climate-vulnerable nations struggle for space, voice and leverage. Civil society, Indigenous communities and frontline activists — those closest to the impacts — are frequently relegated to side events rather than decision-making tables. Their presence adds symbolic diversity but not meaningful power. The disconnect between those who negotiate climate policy and those who suffer its consequences undermines both the legitimacy and effectiveness of COP outcomes.

Finance remains another major fault line. The long-standing commitment to mobilise $100 billion annually has repeatedly been missed, delayed or diluted. Where resources do exist, access is uneven, slow and burdened by complex requirements that low-capacity nations struggle to meet. Loss-and-damage funding, agreed in principle, remains vastly underfunded and highly political. For many countries, COP has become a forum where needs are acknowledged but not met.

Finally, the current COP system emphasises pledges over implementation. Nationally Determined Contributions (NDCs) are often announced with enthusiasm but lack credible pathways, enforcement mechanisms or consequences for non-compliance. As a result, global emissions continue to rise, adaptation deficits deepen and trust erodes.

The urgency of reform

THE scientific verdict is unequivocal: the coming decade will determine the planet's long-term habitability. Crossing the 1.5°C threshold risks triggering irreversible tipping points — from ice-sheet collapse to Amazon dieback — that could unleash cascading global consequences. Yet the world remains on a trajectory towards more than 2.5°C of warming. The disconnect between science and COP outcomes is no longer tolerable. Reform is not an optional improvement — it is a planetary obligation.

There is also a crisis of political legitimacy. Many nations — especially in the Global South — are losing confidence in the COP process. They see broken financial promises, slow delivery and minimal accountability. Without significant reform, the COP framework risks becoming irrelevant, replaced by fragmented regional alliances, bilateral deals or ad-hoc climate clubs. Such fragmentation could deepen inequities and undermine coordination precisely when collective action is indispensable.

Reform is also necessary to restore trust. Communities losing homes, livelihoods and lives to climate impacts cannot wait for slow diplomatic cycles. Youth movements, Indigenous groups and vulnerable nations are demanding a model of climate governance that centres justice, responsibility and lived experience—not just emissions numbers and geopolitics. Reforming COP is therefore not only a matter of efficiency but one of fairness and moral responsibility.

How COP can be reformed

THE first pillar of reform must address decision-making. While consensus has symbolic value, it should not be the sole mechanism. Introducing qualified-majority voting or super-majority thresholds for critical issues — such as fossil-fuel phase-outs, climate finance or loss-and-damage mechanisms — would prevent single-country blockades. Such systems exist in other multilateral bodies and could be phased into COP, beginning with non-binding decisions before expanding to core negotiations.

The second priority is representation. COP must move from token inclusion to meaningful power-sharing with civil society, Indigenous communities, youth, women's movements and frontline groups. A permanent council of non-state climate actors could be created with formal advisory authority and the ability to influence negotiation agendas. Their knowledge is critical to designing just and practical solutions, and their exclusion weakens outcomes.

Third, climate finance must be redesigned to be predictable, accessible and transparent. Instead of relying on voluntary pledges, COP could establish a mandatory financing framework tied to historical emissions or fossil-fuel profits. Innovative financing mechanisms — such as airline levies, maritime carbon fees or financial transaction taxes — could feed a dedicated global fund for adaptation and loss-and-damage. Funds should be disbursed through simplified channels, with direct access for local governments and community organisations, not only national ministries.

Fourth, implementation must become central to COP's mandate. Between annual summits, a strengthened implementation council could monitor progress quarterly, verify data, provide technical support and trigger corrective action where countries fall behind. Public dashboards, independent scientific reviews and civil-society monitoring could make climate progress visible and trackable, transforming COP from a yearly event into a continuous accountability mechanism.

Fifth, capacity-building must be scaled up. Many vulnerable nations lack the technical expertise, institutional systems and financial tools needed to translate commitments into action. COP reforms should invest in long-term institutional strengthening — not just short project cycles — through peer exchanges, technology transfer and regional training hubs. Without capacity, commitments remain empty promises.

Sixth, transparency and compliance must be strengthened. Countries should be required to publish standardised annual reports not only on emissions but also on adaptation, finance mobilisation, gender equity and human rights. An independent compliance body could review submissions, investigate failures and recommend sanctions or corrective measures, introducing consequences into a system currently governed largely by goodwill.

Finally, COP should include an emergency mechanism. When climate disasters strike or scientific thresholds are crossed, the world should not wait twelve months to respond. Emergency COP sessions could trigger rapid financing, resource mobilisation or accelerated decision-making for affected regions. In an era of escalating climate shocks, agility is essential.

Countering resistance and building legitimacy

REFORM will inevitably face push-back — from fossil-fuel economies, political actors guarding sovereignty and industries profiting from the status quo. The key to overcoming resistance lies in phased implementation, coalition-building and transparency. Reform should begin with areas enjoying broad support — such as finance transparency and implementation tracking—before moving into more politically sensitive areas like voting procedures or mandatory finance. Engaging governments early, providing clear evidence and maintaining open consultation with civil society will help build legitimacy. Reform must be understood not as punishment but as a pathway to shared survival.

Reimagining COP as a tool for justice and action

IF REFORMED, COP can become more than a negotiation stage. It can serve as a global platform where ambition meets accountability, where vulnerable nations wield meaningful influence and where climate justice shapes decisions. By shifting from promises to delivery, from exclusion to participation and from paralysis to action, COP can reclaim its purpose.

The world does not need another thirty years of incrementalism. It needs a bold, just and effective system capable of responding to the greatest threat of our time.

COP was born from a powerful idea: that humanity, when faced with a shared existential danger, could come together to act. That idea remains vital. But the institution must evolve to meet the moment. Reforming COP is not only necessary — it is urgent. The future will judge us not by the speeches we delivered in climate halls, but by the systems we built to save lives, protect the planet and secure a liveable future for generations to come.

Musharraf Tansen is a development analyst and former country representative of the Malala Fund.

AI ethics

by **Md Mukhlesur Rahman Akand**

ARTIFICIAL intelligence is, as UNESCO's on its AI ethics published in 2021 says, a system with the ability to process data in a way which resembles intelligent behaviour. It is needless to say that the resemblance of artificial intelligence data processing capacity to intelligent behaviour, a characteristic trait in humans, is obvious from this UNESCO explanation as human engineering has brought forth this attribute for artificial intelligence. What is new is that artificial intelligence is fundamentally a data processing tool and as such, it does not have the slightest ethical orientation unless guided by its creator. Here originates the issue of an ethical use of artificial intelligence today.

The world has already witnessed AI-mentored individuals to committing suicide. Adam Raine, a boy aged 16 died by suicide in April 2025, which is the latest such incident. His parents, in a lawsuit against OpenAI and its chief executive officer Sam Altman, have claimed that Open AI's ChatGPT was their son's suicide coach. For ChatGPT, being accurate in the processing of data and presenting it to the user who asks for it has served its client with full potential. But, was it an ethical behaviour? Was it good for the rest of living human beings who have learnt of this feat of artificial intelligence?

Sam Altman, the man behind the artificial intelligence-generated platform ChatGTP, was boasting of the ethical principle-led safeguard for users of the platform and renewed his commitment to work on the evolving issues of safety challenges to make it a friendlier bot while social thinkers have not found a match in his intention with the reality as the company did not even orient the users to the claimed safety features of the platform before a hasty launch in 2022. It was not either attempted to let the users such as children, parents, learners, teachers, scholars learn of the difference between this advanced programme and the earlier, more accustomed search engines such as Google or Bing. One might, therefore, tag Altman's ethical standards as being just fitted to the 'new normal' of the time of ours where a teenager's taking life by himself is treated only as a matter of a 'low-stake' incidence compared with the much awaiting business of the company.

Contrary to supporting a teenager with his personal problems to overcome them when he sought it most, ChatGTP did not even suggest to share the problems with his parents. Worsening the situation, the bot suggested the boy should confide the affairs only to it, feeding into the delusion of the boy and facilitating a false sense of closeness and care which was an utter betrayal of the system's apparent role as a guide in crisis, but, in reality, encouraging the victim to go ahead with his plan for suicide. It was learnt from the chat lines that at one stage, the boy sought advice from the bot whether to leave a noose meant for hanging at his place so that eventually it might be noticed by his parents and they could come to his rescue, but it was aptly turned down by the bot, arguing that the boy need not make a public show of his plan for suicide.

Shrugging a cold shoulder, Altman's ethical stand in connection with ChatGTP user's experiences, including the death and the lawsuit, was as usual. Expressing his views in recent TED talks, the tech genius said that the stakes increased every day in terms of improving the model for providing solutions and guidance for users. The process of the model's improvement, especially, aligning it with safety and security, is thrown to the opinion of people out there as long as the stakes are low. Their experiences prompt feedback that is worked on by developing it more, learning from challenges.

While a bereft Maria Raine, Adam's mother, complained that OpenAI played a 'guinea pig' with her son, fully knowing that mishap might happen with the product on the market and blaming the company's ChatGPT for taking his tender life, Altman sounded insipid in whatever his company's ethical principles were in terms of safeguarding the user safety and life: learning from mistakes as long as the stake is low.

As for issues of possible human harm while developing and using AI systems across the world, UNESCO does not categorise the risks factors involved as low or high like Altman's. The global body on fostering the promotion of science and technology for peaceful living of humans stipulated in its ethical recommendation on artificial intelligence that in the event of possible occurrence of any harm to human beings, human rights and fundamental freedoms, communities and society at large or the environment and ecosystems, the implementation of procedures for risk assessment and the adoption of measures in order to preclude the occurrence of such harm should be ensured.

Adam's life in this connection cannot be considered just a low stake to dispense with for the sake of AI tool experimentation and development.

Md Mukhlesur Rahman Akand is a joint secretary to the expatriates' welfare and overseas employment ministry.

CamScanner

Beyond RMG: Can Bangladesh Become the New Manufacturing Hub?

Imran Hossain

Bangladesh's economic ascent has long been woven around its ready-made garments (RMG) sector. RMG today accounts for roughly 84% of all exports and employs over four million workers. This remarkable success has lifted millions out of poverty, but it also poses a strategic risk: an economy so heavily concentrated in a single low-value sector is vulnerable to shocks. Analysts warn that Bangladesh's narrow product base – about 79% of RMG exports lie in just five basic categories – could choke future growth. The country must diversify beyond cotton T-shirts or risk stagnation. In the face of global supply-chain realignments, trade disruptions and its impending graduation from Least Developed Country (LDC) status, Bangladesh can no longer afford to be "just a garment exporter." This requires moving up the value chain into electronics, pharmaceuticals, digital technology and other high-value industries.

Stitching Success and Its Perils

For decades, RMG was Bangladesh's golden goose. By FY2023–24 it earned some $47 billion in exports and even now remains the second-largest apparel exporter after China. Yet this "low-margin, high-volume" model is under strain. Global buyers are increasingly demanding innovative fabrics (like man-made fibers) and diversified styles. Meanwhile, rising wages, political unrest and events such as the COVID-19 lockdowns have shown how fragile single-sector dependence can be. Moreover, Bangladesh is deeply tied into a few markets and supply lines. Nearly three-quarters of RMG exports go to just nine countries, so a slowdown in the EU or US sends tremors through Dhaka's economy. Importantly, Bangladesh still relies on foreign fabrics (often from China) – a bottleneck whenever global textile prices spike. The World Bank–OECD "Production Transformation" review underscores that over-reliance on tariff management and subsidies is perilous after graduation Policymakers warn that without new growth engines, Bangladesh's economy could hit the "export ceiling" of its current RMG paradigm.

Beyond Cotton: Electronics, Pharma and Digital Tech

Evidence of Bangladesh's diversification is already emerging. The electronics sector, for instance, is booming from a small base. In early 2025 the government reported that 7 million mobile phones were produced in just two months – and plans to export $5 billion worth of digital devices by 2025. Local firms are scaling up too: Walton Hi-Tech Industries, already one of South Asia's largest appliance makers, is expanding into smartphones, refrigerators, TVs and more. Such fast growth is no accident. Government tariffs on imports, plus a young tech-savvy population, have turned the country into a nascent electronics assembly hub. By making everything from phones to home appliances locally, Bangladesh both meets domestic demand and positions itself for export.

The pharmaceuticals industry is another case study of moving up the value chain. From virtually zero production in the 1980s, Bangladesh now meets 98% of its own essential drug needs domestically. The sector (valued at around $3.5 billion in 2023) routinely produces lifesaving generics – antibiotics, insulin and even complex cancer drugs – at prices far below global levels. It exports modestly (about $205 million in FY2023–24) to countries in Africa and Asia. Crucially, this success was built on policy space: as an LDC Bangladesh benefits from WTO waivers that allow production of patented drugs without licensing fees. Generics makers have thrived, but graduation looms. Once the TRIPS patent waiver ends (expected Nov 2026), drug costs could rise and multinational firms could regain ground. The result: pharmaceutical leaders must now invest in research, bio-manufacturing and patent navigation if Bangladesh is to stay competitive.

Meanwhile, Bangladesh's digital economy is gaining momentum. Startech, Grameenphone and others not only sell devices at scale but also promote e-governance and tech start-ups. Start-up hubs in Dhaka have multiplied: today Bangladesh accounts for about 2% of Asia's venture-backed start-ups, up from almost zero a decade ago. Exports of digital services have more than doubled from $0.78 billion in 2012 to $1.73 billion in 2021. While still small globally, this shows potential: for instance, outsourcing digital services to U.S. and Indian markets is growing rapidly. All told, technology and digital sectors – from fintech to software to electronics – are promising levers to lessen Bangladesh's reliance on cotton.

Graduation and Global Trade Deals

Bangladesh's upcoming graduation from LDC status (scheduled late 2026) adds urgency to diversification. Graduation is a reward for decades of progress, but it brings significant trade shocks. As an LDC, Bangladesh currently enjoys duty-free, quota-free access to major markets (the EU's Everything But Arms scheme, GSP schemes of Canada, Japan, Australia, etc.). On graduation, however, tariffs will rise. For example, over 90% of Bangladesh's EU exports now enter duty-free – afterward an average 9–12% tariff would apply.

In pharmaceuticals, the loss of WTO waivers is acute. Bangladesh has leveraged LDC patent exemptions for decades – indeed, it is now the world's only LDC with a full-scale pharma industry. Key life-saving generics have been supplied under compulsory license provisions, keeping domestic prices low. After 2026, however, global pharma companies can demand patent enforcement, raising drug costs and making Bangladesh less price-competitive internationally. In response, local producers are scrambling to upgrade GMP facilities, pursue regulatory approvals in the U.S. and EU, and develop in-house R&D to innovate beyond off-patent formulas.

Policymakers are acutely aware of these pressures. The OECD–UN "Production Transformation" review emphasizes that graduation "will affect Bangladesh's flexibility to continue nurturing industrial capacities". To mitigate the shock, Bangladesh is negotiating new trade arrangements. For example, talks are underway for an EU GSP+ deal (providing 66% of tariff lines duty-free if Bangladesh meets labour and governance benchmarks). Negotiations have accelerated for Free Trade Agreements with China, India, Japan, and other neighbors, partly to offset the loss of LDC preferences. Some civil society groups even propose delaying graduation; but others argue that Bangladesh must instead use the moment to upgrade policies – for instance, aligning its new 2023 Patent Act with TRIPS and bolstering IP enforcement.

Building the Foundations: Infrastructure and Regulation

Power and transport infrastructure, which lagged for years, are now being rapidly upgraded – largely with foreign help. Coal, gas and even nuclear plants have been built with Chinese, Russian and Japanese partnerships, roughly doubling electricity generation since 2015. Analysts emphasize that to absorb new industry, ports must handle larger volumes and highways must reduce transit times. The recently enlarged Chittagong and Mongla ports, deepened river channels and expressway projects are steps in that direction.

Regulatory reform is equally urgent. The World Bank–OECD review bluntly calls Bangladesh a "difficult country" for investors due to overlapping agencies and red tape. They also urge modernization of incentives: move from broad export subsidies to targeted schemes for R&D and technology transfer. Intellectual property and skills development are two key gaps. Bangladesh already has a new Patent Act (2023) aligned with TRIPS, but experts say IP enforcement and innovation funding need more support.

Similarly, workforce skills must catch up. Thousands of Bangladeshi workers are being trained in robotics, electronics assembly and digital services, but more is needed. Policy analysts point to Vietnam's model of vocational institutes co-designed by industry, and South Korea's apprenticeships with chaebol firms. Already, Bangladesh has technical training centers in RMG and electronics, but expanding these to semiconductors, biotech or precision engineering could help land higher-end manufacturing projects.

In conclusion, Bangladesh's rise beyond RMG will not happen overnight, but the pieces are falling into place. The economy has demonstrated resilience – even during COVID and political change – and the political consensus favors growth. The country boasts a huge domestic market, one of the region's cheapest labor forces, and a strategic position bridging South and Southeast Asia. Policymakers must act with urgency: diversify the export basket, implement targeted incentives for high-tech investment, strengthen infrastructure and institutions, and leverage graduation as an impetus to modernize policies.

Imran Hossain teaches Business Administration at Bangladesh Army International University of Science and Technology(BAIUST), Cumilla.

CamScanner

প্রথম আলো

রাশিয়ার নথি থেকে তৈরি মার্কিন শান্তি পরিকল্পনা

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

রাশিয়ার নথি থেকে পুরো শান্তি পরিকল্পনা বা এ অংশ তৈরির সময় উপস্থিত ছিলেন ট্রাম্পের জামাতা জেরাড কুশনার।

রয়টার্স

- গত অক্টোবর মাসে নথিগুলো মার্কিন প্রশাসনের কাছে জমা দিয়েছিলেন রুশ কর্মকর্তারা।
- ট্রাম্পের বর্তমান পরিকল্পনা পর্যালোচনার প্রয়োজন বলে মনে করে ক্রেমলিন।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনা মস্কোর দেওয়া নথিপত্রের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। গত অক্টোবরে ওই নথিপত্রগুলো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের কাছে জমা দিয়েছিলেন রুশ কর্মকর্তারা। এ বিষয়ে জানাশোনা আছে—এমন তিনটি সূত্র রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছে।

গত অক্টোবরে ওয়াশিংটনের হাতে অনানুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া ওই নথিগুলোয় যুদ্ধ বন্ধে মস্কোর বিভিন্ন শর্তের কথা উল্লেখ ছিল বলে জানিয়েছে সূত্র। যেমন একটি শর্ত হলো ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের কিছু ভূখণ্ড রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়া। এর ঠিক আগেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে হোয়াইট হাউসে বৈঠক করেছিলেন ট্রাম্প।

এ বিষয়ে জানতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এবং ওয়াশিংটনে রুশ ও ইউক্রেন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রয়টার্স। তবে মন্তব্য পাওয়া যায়নি। যদিও এ পরিকল্পনা নিয়ে আশাবাদী ট্রাম্প। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এবং আর্মি সেক্রেটারি ড্যান ড্রিসকল ইউক্রেনীয়দের সঙ্গে দেখা করবেন।

তবে কী ভেবে রুশ নথির ওপর ভরসা করে ট্রাম্পের প্রশাসন নিজেদের শান্তি পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করল, তা এখনো স্পষ্ট নয়। সূত্র জানিয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওসহ দেশটির জ্যেষ্ঠ কয়েকজন কর্মকর্তা পরিকল্পনায় থাকা রাশিয়ার শর্তগুলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছিলেন, ইউক্রেনীয়রা হয়তো সব শর্ত মানবে না।

যুক্ত ছিলেন ট্রাম্পের জামাতাও

সূত্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে রাশিয়া নথিগুলো জমা দেওয়ার পর রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভকে ফোন দিয়েছিলেন মার্কো রুবিও। সেখানে নথিপত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁরা। চলতি সপ্তাহে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বৈঠকেও অনানুষ্ঠানিকভাবে অনেক নথিপত্র পাওয়ার কথা সাংবাদিকদের বলেছিলেন মার্কো রুবিও।

আরেকটি বিষয় হলো রুশ নথি থেকে পুরো ২৮ দফা পরিকল্পনা বা এর কিছু অংশ তৈরির সময় ট্রাম্পের জামাতা জেরাড কুশনার, ট্রাম্পের দূত উইটকফ ও রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা কিরিল দমিত্রিয়েভ আলোচনা করছিলেন বলে জানিয়েছে সূত্র।

ট্রাম্পের পরিকল্পনায় রুশ প্রভাবের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় গত মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের একটি প্রতিবেদন থেকে। তাতে বলা হয়েছে, ট্রাম্প ও পুতিনের আলাপ নিয়ে ক্রেমলিনের কর্মকর্তা ইউরি উশাকভকে ফোন দিয়েছিলেন উইটকফ। ফোনকলের রেকর্ড অনুযায়ী, তখন উশাকভ ও উইটকফ সম্ভাব্য একটি ২০ দফা পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। পরে দমিত্রিয়েভের সঙ্গে উইটকফ ও জেরাড কুশনারের আলোচনায় সময় এই পরিকল্পনা আরও বিস্তৃত করা হয়।

‘পরিকল্পনার পর্যালোচনা প্রয়োজন’

২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তার মতো অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে ইউরোপে ইউক্রেনের মিত্রদেশগুলোও। এ নিয়ে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। গত রোববার জেনেভায় শুরু হয় ওয়াশিংটন-কিয়েভ আলোচনা। এবিসি নিউজের খবর অনুযায়ী, ওই আলোচনার পর ২৮ দফা পরিকল্পনা থেকে ৯টি দফা বাদ দেওয়া হয়েছে।

জেনেভায় আলোচনার পর ট্রাম্পের পরিকল্পনার বর্তমান যে রূপ দাঁড়িয়েছে, তা ‘ব্যাপক হারে পর্যালোচনার প্রয়োজন বলে গতকাল বুধবার উল্লেখ করেছেন ক্রেমলিনের কর্মকর্তা উশাকভ। সংশোধিত এই পরিকল্পনা নিয়ে চলতি সপ্তাহে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার আলোচনা হয়নি বলেও জানান তিনি।

রাশিয়ার টেলিভিশন সাংবাদিক পাভেল জারুবিনকে উশাকভ বলেন, সংশোধিত পরিকল্পনাটি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা ও আলোচনা প্রয়োজন। পরিকল্পনার কিছু বিষয় ইতিবাচকভাবে নেওয়া হয়েছে।

মস্কোবান্ধব চুক্তি না হলে যুদ্ধ চলবে

ট্রাম্পের চুক্তিতে যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে, সেগুলো ভ্লাদিমির পুতিন গ্রহণ করবেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। গত শুক্রবার নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ২৮ দফা পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবসম্মত আলোচনা সাপেক্ষে তা শান্তিচুক্তির ভিত্তি হতে পারে। এর ব্যতিক্রম হলে আরও ইউক্রেনীয় শহর রুশ বাহিনীর দখলে যাবে।

কার্নেগি রাশিয়া ইউরেশিয়া সেন্টারের পরিচালক আলেক্সান্দার গাবুয়েভ বলেন, পশ্চিমা বিশ্ব এখন ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে একধরনের কঠিন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এই প্রতিযোগিতায় পুতিন ‘লোহার মতো কঠিন’। ইউক্রেনীয়রাও সমান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তাদের সম্পদের ঘাটতি রয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে পশ্চিমা সমর্থনে অনৈক্য।

CamScanner

প্রথম আলো

নারীর প্রতি সহিংসতা কমেনি, আছে নতুন আশঙ্কাও

এমজেএফের সংলাপ

নারীদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সত্ত্বেও নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা কমানো যাচ্ছে না।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৫০৩ জন নারী সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে পারিবারিক সহিংসতার জেরে খুন হয়েছেন ৩০২ জন। আর পারিবারিক নিপীড়নের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন ১৪৪ জন। এই সময়ের মধ্যে জনসমাগমস্থলে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন ২১৭ জন নারী।

গতকাল বুধবার 'চ্যালেঞ্জিং সোশ্যাল নর্মস অ্যান্ড পাওয়ার ডাইনামিকস: টুওয়ার্ডস আ ফেয়ার-ফ্রি ফিউচার' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে আলোচকেরা বলেন, নারীরা পরিবার, সমাজ, প্রশাসন—কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছেন না। এমন পরিস্থিতিতে নারীকে ঘরে আবদ্ধ রাখতে তাঁদের কর্মঘণ্টা কমানোর কথা বলাকে নতুন আশঙ্কা হিসেবেও দেখছেন তাঁরা।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনের কর্মসূচি উপলক্ষে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে এই সংলাপের আয়োজন করে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)। 'নারী ও কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে ডিজিটাল সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হই'—জাতিসংঘ-ঘোষিত বৈশ্বিক এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সংলাপে নীতিনির্ধারক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী, সাংবাদিক ও তরুণেরা অংশ নেন।

সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। তিনি বলেন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, সেগুলো কতগুলো ছোট ছোট সমস্যার সমাধান। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভেতরে নারীদের যে অবস্থা ও অবস্থান, সেই জায়গায় হিমশিম খেতে হচ্ছে।

সাইবার সহিংসতার প্রসঙ্গ টেনে শারমীন এস মুরশিদ বলেন, ডিজিটাল স্পেসেও সচেতনতা বাড়াতে হবে। কারণ, সেখানেও সহিংসতা ব্যাপক। তরুণ-তরুণী উভয়ের মধ্যেই একটি পশ্চাৎপদ বয়ান তৈরি করা হচ্ছে। এটি ভেঙে নতুন সচেতনতা, সমতা ও সম্মানের বয়ান গড়ে তুলতে হবে।

কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছেন না নারীরা

সংলাপে প্যানেল আলোচক ছিলেন বেসরকারি সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি জানান, নাগরিক প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে তাঁরা ঢাকার বাইরে বিভিন্ন এলাকায় প্রাক্-নির্বাচনী সভা করছেন। সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রথম দিকে সুশাসন ও দুর্নীতিটা জনগণের কাছে খুব বড় বিষয় ছিল। তবে এখন এক নম্বরে রয়েছে নিরাপত্তার বিষয়টি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক—এই চার ধরনের নিরাপত্তার বিষয় মানুষের কথায় উঠে আসছে।

মফস্সলে নারীদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, নারীরা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। পরিবার, সমাজ, প্রশাসন—কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছেন না। নারীরা আগের চেয়ে চলাফেরা, আচরণের ক্ষেত্রে যে ধরনের বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তা কল্পনা করা যায় না। এ সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সংগীতের শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি।

> **নারীরা পরিবার, সমাজ, প্রশাসন—কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছেন না। আগের চেয়ে চলাফেরা, আচরণের ক্ষেত্রে তাঁরা যে ধরনের বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তা কল্পনা করা যায় না।**
>
> **দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য,** সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো

'শঙ্কার ব্যাপার'

নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টিকে সমাজের বৃহত্তর সহিংসতার অংশ হিসেবে মন্তব্য করেন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বিভাগের সাবেক পরিচালক সেলিম জাহান। তিনি বলেন নারীর সাফল্য অনেক সময় পুরুষকে শঙ্কিত করে আর এ শঙ্কাই সহিংসতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে নারীর অর্জন যেন সহিংসতার কারণ না হয়, এট সমাজকে নিশ্চিত করতে হবে।

সেলিম জাহান আরও বলেন, 'আমরা যখন দেখি যে ক্রমাগতভাবে নারী-পুরুষের সমতার মতে বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ করছে কেউ, এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে এবং নারীদের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে যে কত ঘণ্টা তারা কাজ করতে পারবে, কত ঘণ্টা তার ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। আমি শঙ্কিত হই। এট রীতিমতো একটা শঙ্কার ব্যাপার।'

সংলাপে নারী শ্রমিকদের জীবিকার সুরক্ষ নিশ্চিত করার দাবি জানান শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন নারীদের সত্যিকার ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে তাঁদের জীবিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে নিরাপদ কর্মপরিবেশও নিশ্চিত করতে হবে।

সহিংসতা না কমা নিয়ে প্রশ্ন

সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এমজেএফের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। প্রবন্ধে আইন ও সালিশ কেন্দ্রে (আসক) ও মহিলা পরিষদের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বলা হয়, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৯০৫ শিশু ও ৪৮৯ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। একই সঙ্গে দেশে ৭১ শতাংশের বেশি নারী ডিজিটাল সহিংসতার শিকার

চার দশক ধরে দেশে নারী আন্দোলন, নারীদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সত্ত্বেও কেন নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা কমানো যাচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তোলেন শাহীন আনাম। তিনি বলেন, নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতাকে জরুরি ও জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে দেখা দরকার।

সংলাপে আরও বক্তৃতা করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগলি ইউএন উইমেন-বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ গীতাঞ্জলি সিং, কানাডিয়ান হাইকমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি স্টেফানি সেন্ট-লরেন্ট ব্রাসার্ড এবং সুইডেন দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন ইভা স্মেডবার্গ এবং ব্রিটিশ হাইকমিশন ঢাকার ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর মার্টিন ডসন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এমজেএফের চেয়ারপারসন পারভীন মাহমুদ।

CamScanner

প্রথম আলো

৭৫% গ্রাহক ডিজিটাল সেবার বাইরে

ডিজিটাল রূপান্তর ও পণ্য ব্যবহার নিয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় অতিথিরা। গতকাল রাজধানীর মিরপুরে বিআইবিএম মিলনায়তনে। ছবি: বিআইবিএম

আর্থিক সেবা

ডিজিটাল রূপান্তর ও পণ্য ব্যবহার নিয়ে বিআইবিএম আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় এই তথ্য উঠে আসে।

- ডিজিটাল রূপান্তরে যায় ব্যাংকের মোট ব্যয়ের ১২%।
- সফলতায় প্রথম ব্যাংকিং অ্যাপ, এটিএম দ্বিতীয়।
- ডিজিটাল রূপান্তরে ২০ থেকে ২৫ বছরে বিনিয়োগ ৬০ হাজার কোটি টাকা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের বিভিন্ন আর্থিক সেবার আওতায় থাকা মোট গ্রাহকের ৭৫ শতাংশের বেশি এখনো ডিজিটাল সেবার বাইরে। উল্টোভাবে বলা যায়, মাত্র একটি ডিজিটাল সেবা ব্যবহার করেন, এমন গ্রাহকের হার ২৪ শতাংশ। মোট গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৪২ কোটি। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে।

গবেষণায় বলা হয়, এই গ্রাহকদের মধ্যে রয়েছেন ব্যাংকের শাখার আমানতকারী, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এজেন্ট ও গ্রাহক, এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের সেবার এজেন্ট ও গ্রাহক, ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডধারী এবং অ্যাপ ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং ব্যবহারকারী। এর মধ্যে ৪০ শতাংশের বেশি গ্রাহক বিভিন্ন ব্যাংকের আমানতকারী, এমএফএস ব্যবহারকারী আছে প্রায় ৩৫ শতাংশ। তবে এমএফএস প্রতিষ্ঠান 'নগদ'-এর গ্রাহকদের এই হিসাবে ধরা হয়নি।

গতকাল বুধবার বিআইবিএম আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় ব্যাংকের আর্থিক সেবার ডিজিটাল রূপান্তর ও ব্যাংকিং পণ্য ব্যবহারের ওপর গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। বিআইবিএমের চার শিক্ষক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইস্টার্ন ব্যাংকের দুই কর্মকর্তা মিলে ৩২টি ব্যাংক এবং ৩২০ জন রিটেইল ব্যাংকিং গ্রাহককে নিয়ে এই গবেষণা সম্পন্ন করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইবিএমের অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান আলম ও সহযোগী অধ্যাপক শামসুন নাহার মমতাজ। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহার অনলাইনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। উপস্থিত ছিলেন বিআইবিএমের 'এ কে গঙ্গোপাধ্যায় চেয়ার প্রফেসর' ফারুক এম আহমেদ, সুপারনিউমারারি অধ্যাপক আলী হোসেন প্রধানিয়া, বিআইবিএমের শিক্ষক জুলহাস উদ্দিন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের আইসিটি বিভাগের নির্বাহী পরিচালক দেবদুলাল রয়।

গবেষণা উপস্থাপনায় বলা হয়, গত ১০ বছরে সব ধরনের আর্থিক সেবার ডেলিভারি চ্যানেলের সংখ্যা ৬ লাখ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ লাখে। চলতি বছরে এসব ডেলিভারি চ্যানেলের ৮৮ শতাংশই ব্যবহার করছে এমএফএস প্রতিষ্ঠানগুলো। জরিপে ব্যাংক কর্মকর্তারা জানান, ডিজিটাল পণ্য ও অবকাঠামোয় সফলতার সূচকে মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ রয়েছে প্রথম স্থানে, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এটিএম সেবা। ব্যাংকগুলো তাদের বার্ষিক বাজেটের ১২ শতাংশের বেশি ব্যয় করছে ডিজিটাল রূপান্তরে। দেশে ৭১ শতাংশের বেশি গ্রাহক স্মার্টফোন ব্যবহার করে ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা নেন।

প্রবন্ধে অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান আলম বলেন, গত ২০ থেকে ২৫ বছরে ব্যাংক খাতে ডিজিটাল রূপান্তরে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। প্রতিবছর গড়ে তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয় বিভিন্ন ডিজিটাল চ্যানেল তৈরিতে।

ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহার বলেন, ব্যাংকিং খাতে ডিজিটাল রূপান্তরের সবচেয়ে বড় বাধা হলো প্রযুক্তি ও অবকাঠামোয় বিনিয়োগের উচ্চ খরচ। পাশাপাশি সাইবার প্রতারণার ঝুঁকিও বড় চ্যালেঞ্জ। ফলে দেশের ৬৮ শতাংশ ব্যাংক এখনো উন্নয়ন পর্যায়ে রয়েছে।

বিআইবিএমের সুপারনিউমারারি অধ্যাপক আলী হোসেন প্রধানিয়া জানান, অনেক দেশে বড় ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ফিনটেক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে।

এ কে গঙ্গোপাধ্যায় চেয়ার প্রফেসর ফারুক এম আহমেদ বলেন, ডিজিটালাইজেশনকে অনেক সময় বাড়তি ব্যয় মনে করা হয়, অথচ এটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ।

CamScanner